ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana™
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬৩ বর্ষ ৭ সংখ্যা ।। ১৪ কার্তিক, ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ১ নভেম্বর ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

সংসদে গৃহীত প্রস্তাবই হোক ভারতের কাশ্মীর নীতির ভিত্তি : শ্রীভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি।। 'কাশ্মীর'-এর পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। গত ১৭ অক্টোবর সকালে সঙ্ঘের প্রধান কেন্দ্র নাগপুরে বিজয়া দশমী উৎসবে তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। শ্রীভাগবত বলেন, কাশ্মীরের পরিস্থিতি সংকটাপন্ন। আমাদের উপেক্ষার ফলে বালটিস্থান এবং গিলগিট এলাকা পাকিস্তানের অঙ্গীভূত হয়েছে আর চীন সেখানে সেনা সমাবেশ করে ভারতকে ঘিরে ফেলার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে। আবার আমেরিকা আফগানিস্তান থেকে সসম্মানে পিছু হঠে পাকিস্তানকে সঙ্গী করে কাশ্মীর উপত্যকায় পা রাখার জন্য অনুকূল পরিস্থিতি নির্মাণে সচেষ্ট। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ওই জটিল আবর্তে কাশ্মীরকে গলাধঃকরণের আগেই আমাদের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ। আফগানিস্তানেও ভারতের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করে কাশ্মীর উপত্যকাকে অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে একাত্ম করার দিকে অগ্রসর হতে হবে। যে কোনও কেন্দ্র সরকারের পক্ষে দেশের অবিভাজ্য এলাকার জন্য একাজ একান্তভাবেই করণীয়। ভারতের সার্বভৌম এবং প্রভুত্বপূর্ণ সরকারের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অঙ্গুলিহেলনে নিরাপত্তা-বাহিনীর উপর নিত্য নিয়মিত পাথর-ছোঁড়া লোকেদের কাছে মাথা নত করা উচিৎ নয়। সেনাদের ক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করে, বাঙ্কার উচ্ছেদ করে ভারতের একাত্মতা এবং অখণ্ডতা রক্ষা করা সম্ভব নয়।

১৯৯৪ সালে ভারতের সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত কাশ্মীর বিষয়ক প্রস্তাবের সংকল্পকেই নীতি হিসেবে গ্রহণ করা দরকার। আমাদের সদা-সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন মহারাজা হরি সিং-এর স্বাক্ষরিত ভারতভুক্তি চুক্তিই জম্মু-কাশ্মীরের ভারতে সংযুক্তির ক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় এবং চূড়ান্ত বলে গণ্য।

জম্মু-কাশ্মীরের সকলেই বিচ্ছিন্নতাবাদী নন

জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য মানে শুধুমাত্র কাশ্মীর উপত্যকা নয়। আর ওখানে 'স্বশাসন'-এর দাবী যারা করেছে অথবা তার আড়ালে বিচ্ছিন্নতাবাদকে উসকে দিয়ে 'স্বাধীনতা'-র স্বপ্ন দেখা লোকের সংখ্যা বেশি নয়। সেজন্য ওরকম বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কথা শোনা বা প্রশ্রয় দেওয়ার অর্থই হলো সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে আরও জটিল করে তোলা। এটাই দেখা যাচ্ছে। অতএব, আমাদের উপত্যকার সঙ্গে জম্মু ও লাদাখ এলাকাবাসীদের অসুবিধার কথা এবং এই দুই এলাকার সঙ্গে বছরের পর বছর যাবৎ চলে আসা বিমাতৃসুলভ এবং

পক্ষপাতমূলক ব্যবহারের বিষয়ে গভীরভাবে বিচার-বিবেচনা করতে হবে। উপত্যকার যুবসমাজ —যারা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উস্কানির ফলে বিপথগামী, তারা এবং সর্বসাধারণ জনগণের সঙ্গে কথাবার্তা অবশ্যই বলা উচিৎ। কিন্তু একইসঙ্গে সম্পূর্ণ জম্মু-কাশ্মীরের জাতীয়তাবাদী মুসলমান, গুর্জ্জর, পার্বত্যবাসী, শিয়া, শিখ, বৌদ্ধ সম্প্রদায়, কাশ্মীরী পণ্ডিত এবং অন্য হিন্দুদের মনোভাবনা, আবশ্যকতা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি নজর দেওয়াও নিতান্ত আবশ্যক। এছাড়া পাক-দখলীকৃত কাশ্মীর থেকে যে সকল শরণার্থীরা এসেছেন তাঁদের দীর্ঘদিনের ন্যায়পূর্ণ দাবীর প্রতি শীঘ্রাতিশীঘ্র মনযোগ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। যে সকল কাশ্মীরী পণ্ডিত নিজের ঘর-বাড়ি থেকে উৎখাত হয়েছেন, বিতাড়িত হয়েছেন তাদেরকে সসম্মানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিরাপত্তা এবং উপার্জনের ব্যবস্থা করে তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাশ্মীর উপত্যকাতেই পুনর্বাসন দেওয়া হোক। এঁরা সবাই ভারতবর্ষের সঙ্গে একাত্মতা চান। সেজন্য এঁদের সবার সুরক্ষা, উন্নয়ন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে বিচার-বিবেচনা জম্মু-কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের প্রসঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। এসকল বিষয়ে দৃষ্টি দিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলেই জম্মু-কাশ্মীর সমস্যার বিষয়ে আলাপ-আলোচনা সর্বাত্মক এবং ফলদায়ী হতে পারে।

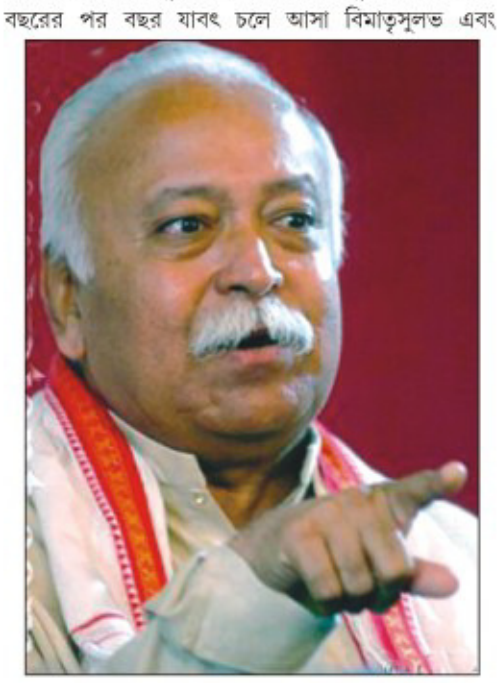

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে জম্মু-কাশ্মীরের প্রজা-সাধারণ ভেদাভেদহীন সুশাসন ও শান্তির জন্য আতুর। তা যাতে তাঁরা সত্বর পান সেজন্য সরকার ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে তার ব্যবস্থা করা দরকার।

শ্রীরামজন্মভূমি বিষয়ে আদালতের রায় এক শুভ সংকেত

প্রাচীনকাল থেকেই এদেশে ধর্মের বিজয়যাত্রার এবং আনন্দের দিন হিসেবে বিজয়া দশমী উৎসব পালিত হয়ে আসছে। এবারকার উৎসব গত ৩০ সেপ্টেম্বর আদালতের প্রদত্ত রায়ে এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চের ওই রায় শ্রীরামজন্মভূমিতে এক সুরম্য মন্দির নির্মাণের পথ প্রশস্ত করবে। মর্যাদাপুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সারা পৃথিবীর হিন্দুদের কাছে দেবতাস্বরূপ এবং সেইসঙ্গে এদেশের অস্মিতা, একাত্মতা, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং বিজিগীষু মনোভাবের প্রতীক। রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি এবং তার মান-মর্যাদারও প্রতীক বা পরিচায়ক। এজন্য স্বাধীন ভারতের মূল সংবিধানে ভারতের আদর্শ, আকাঙ্ক্ষা এবং পরম্পরাকে তুলে ধরার জন্য যে সকল ছবি দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসাবশেষের তথা আশ্রমিক জীবনযাপনের চিত্র রয়েছে

(এরপর ৪ পাতায়)

এটিএস চার্জশীটে আদপেই অভিযুক্ত নন ইন্দ্রেশকুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আজমীর বিস্ফোরণ মামলায় চার্জশীটে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সর্বভারতীয় কার্যকর্তা ইন্দ্রেশকুমারের নামোল্লেখ থাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছে বিজেপি, আর এস এস এবং ভি এইচ পি। ওই চার্জশীটে বলা হয়েছে, ২০০৫-এর ৩১ অক্টোবর রাজস্থানের জয়পুরে এক গুজরাটি গেস্টহাউসে অন্যান্য ছয়জনের সঙ্গে এক গোপন বৈঠকে ইন্দ্রেশকুমার উপস্থিত ছিলেন। এই অভিযোগের প্রত্যুত্তরে ইন্দ্রেশকুমার জানিয়েছেন, ''এটিএস (অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড) চার্জশীট অনুসারে যদিও আমি অভিযুক্ত নই, কিন্তু এটা সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। সম্পূর্ণরূপে একটি ভিত্তিহীন ঘটনা। আদালতে এরকম একটা সাজানো ঘটনাকে নিয়ে যাওয়া দুর্ভাগ্যজনক। আর এস এস কোনও রকম সামাজিক ও রাজনৈতিক হিংসাত্মক

(এরপর ১৩ পাতায়)

প্রকাশ্য ভারত বিরোধিতা সত্ত্বেও অরুন্ধতীকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না কেন ?

অরুন্ধতী রায়

গূঢ়পুরুষ।। সম্প্রতি দিল্লিতে মাওবাদী বুদ্ধিজীবীদের আয়োজিত একটি সেমিনারে লেখিকা অরুন্ধতী রায়ের বক্তব্যকে ঘিরে সারা দেশজুড়ে প্রতিবাদ ও বিতর্ক শুরু হয়েছে। গত ২১ অক্টোবর হয়ে যাওয়া এই সেমিনারের বিষয় ছিল, ''কাশ্মীর, স্বাধীনতা না দাসত্ব?'' বক্তারা ছিলেন হুরিয়ত নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানি, মাওবাদী চিন্তাবিদ সুজাতা রাও এবং বুকার পুরস্কারপ্রাপ্তা লেখিকা অরুন্ধতী রায়। এই তিন বক্তারই বক্তব্য, ভারত সৈন্যবলে কাশ্মীরকে পদানত করে রেখেছে। কাশ্মীর একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। সেখানের মানুষ প্রতিদিন স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রাণ দিচ্ছেন...ইত্যাদি। সুজাতা রাও এবং গিলানি চীন-পাকিস্তানের শেখানো বুলি আওড়াবেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই। বিতর্কেরও কিছু নেই। কিন্তু অরুন্ধতী রায়কে সম্মান জানিয়ে ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রিত সংস্থা সাহিত্য আকাদেমি সম্প্রতি তাঁকে পুরস্কৃত করেছে। তাই বুকার ও সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্তা প্রকাশ্য সম্মেলনে বক্তব্য রাখলে গুরুত্ব দিতে হয়।

অরুন্ধতী রায়ের আহ্বান, ''ভুখে নঙ্গে হিন্দুস্থান সে কাশ্মীর কো আজাদ করো''। অর্থাৎ দরিদ্র, অভুক্ত, উলঙ্গ মানুষের দেশ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই কাশ্মীরের মানুষ উন্নত বিত্তবান জীবনযাত্রা পাবে। তা না হলে ভারতীয় ভিখারিদের সঙ্গে যুক্ত থাকলে কাশ্মীরীরাও ভিখারি হয়ে যাবে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না এই লেখিকা আরও বলেছেন, ''কাশ্মীর কোনওকালেই ভারতের অংশ ছিল না। ঐতিহাসিক কাল

সৈয়দ আলি শাহ গিলানি

থেকেই কাশ্মীর পৃথক রাষ্ট্র, এটি স্বীকৃত সত্য। একদা ভারতের বৃটিশ শাসকরা এই সত্য স্বীকার করেছিল। স্বাধীনতার পর ভারত সেনা পাঠিয়ে কাশ্মীর দখল করে নেয়। সেই দখলদারি থেকে মুক্ত হতে কাশ্মীরে স্বাধীনতার যুদ্ধ চলছে।''

প্রশ্নটা এখানেই। প্রকাশ্যে ভারত বিরোধী প্রচার চালানো এবং কাশ্মীরে

(এরপর ১৩ পাতায়)

বিসর্জনের শোভাযাত্রায় মুসলিম তাণ্ডব

সংবাদদাতা।। বিসর্জনের শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে মুসলিম গুন্ডারা উত্তর দিনাজপুরের বিভিন্ন স্থানে তাণ্ডব চালালো। খবরে প্রকাশ, গত ১৮ অক্টোবর করণদিঘী থানার সাবধান গ্রামে প্রতি বছরের মতো এবারও পুলিশের নির্ধারিত পথেই দুর্গাপূজা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা চলছিল। শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন মহিলারা। রাস্তায় অতর্কিতে মুসলিম মহল্লার কাছে কিছু

উত্তর দিনাজপুর

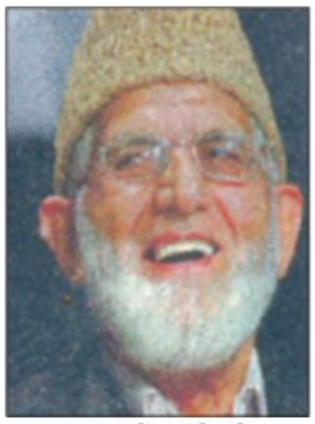

মুসলিম গুন্ডা শোভাযাত্রা আক্রমণ করে পুলিশের সামনেই। আক্রমণকারীদের হাতে ছিল বিভিন্ন ধারালো অস্ত্র। এই ঘটনায় ছয়জন নাবালিকা সহ মোট ১২ জন আহত হয় ও তাদের করণদিঘী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ ঘটনায় বাধা দিতে গেলে তাদেরও ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করলে পুলিশ মহম্মদ নজরুল নামে এক মুসলিম দুষ্কৃতীকে আটক করে। পুলিশের সামনে সীমান্ত সংলগ্ন এই গ্রামে এ ধরনের ঘটনায় হিন্দু গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত। যে মুসলিম

(এরপর ১৩ পাতায়)

৩১টি পুজো বয়কট

নিজস্ব প্রতিনিধি।। দেগঙ্গায় সাম্প্রতিক হিন্দু-নির্যাতনের প্রতিবাদে এবছর উত্তর ২৪ পরগণার দেগঙ্গা ব্লকে ৩১টি পুজো কমিটি বাতিল করে তাদের দুর্গোৎসব। তৃণমূলী সাংসদ হাজী নুরুল ইসলামের প্রত্যক্ষ মদতে এলাকায় যে ভয়ের ও থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছিল তারই ফলশ্রুতিতে একপ্রকার বাধ্য হয়েই দুর্গাপুজোর আনন্দ থেকে বঞ্চিত হলেন দেগঙ্গার মানুষ। সারা পশ্চিমবঙ্গ যখন আলোর রোশনাই-এ মাতোয়ারা, তখন পশ্চিমবঙ্গেরই একটি ক্ষুদ্র

দেগাঙ্গায় দুর্গোৎসব

ভূখণ্ড মুসলিম দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবের শিকার হয়ে জীবনের রূপ-রস-বর্ণ হারিয়ে নিকষ কালো অন্ধকারে ডুবে ছিল। যে ৩১টি পুজো কমিটি দেগঙ্গা ব্লকে এবার পুজো বয়কট করেছে তারা হলো—(১) দেগঙ্গা থানা পাড়া, (২) দেগঙ্গা বিপ্লবী কলোনি, (৩) দেগঙ্গা যুবক সঙ্ঘ, (৪) দেগঙ্গা বিডিও অফিস পাড়া, (৫) দেগঙ্গা মিলন সঙ্ঘ, (৬) চট্টল পল্লীর চট্টল সমিতি, (৭) বেড়াচাঁপা মাতৃমন্দির, (৮) বেড়াচাঁপা সাধুখাঁ পাড়া, (৯) ভাসলিয়া রাংখোলা তরুণ সঙ্ঘ,

(এরপর ১৩ পাতায়)

প্রবঞ্চক ও জনগণের নির্যাতক সিপিএমের বিদায় এবার আসন্ন

নিশাকর সোম।। সিপিএম-নেতাদের এখন হতাশাগ্রস্ত অবস্থা। সিপিএমের রাজ্য-সম্পাদক সম্প্রতি কলকাতা পার্টির একসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন, ''যাঁরা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছেন তাঁরা পার্টি ত্যাগ করুন।'' এর আগে রাজ্য-কমিটির অধীনের পার্টি ইউনিটের সদস্যদের সভায় বলেছিলেন, ''এখন যে-সব সদস্য ভাবছেন, দেখি কারা ক্ষমতায় আসে? তাঁদের বলছি, পার্টি ছেড়ে দিন। পার্টিটা সুবিধা ভোগ করার স্থান নয়।'

সিপিএমের কলকাতা জেলাপার্টির সভাটি ডাকা হয়েছিল পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে। এই সভা কিন্তু বস্তুত পার্টি-নেতাদের মন ভরাতে পারেনি। কারণ বিমান বসুদের বক্তৃতা পার্টি সদস্যদের উদ্দীপনা সঞ্চার করে না। এখানে প্রশ্ন উঠেছে, ১৯৬৪-তে সিপিএম-পার্টির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল— বিদেশী পুঁজি, দেশী একচেটিয়া পুঁজি বিরোধী এবং সামন্ত বিরোধী জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী নিয়ে। পার্টি-কর্মসূচীতে এটাও বলা হয়েছিল, রাজ্যে রাজ্যে যে রাজ্য সরকার প্রতিষ্ঠা হবে তা হবে অতিক্রান্তিকালীন সরকার। সেই সরকারের কাজ হবে জনগণতান্ত্রিক মোর্চা গড়ে তোলা এবং শ্রমিক-কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করে সারা দেশের সামনে বিকল্প নীতি তুলে ধরে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে যাওয়া। হা হতোস্মি! সেই নীতিকে দূরে ঠেলে দিয়ে তিন দশক ধরে সিপিএম পরিচালিত সরকার বিদেশী পুঁজি, একচেটিয়া দেশী পুঁজিবাদীদের স্বার্থ রক্ষা করেছে— শ্রমিক-কৃষকদের স্বার্থ বিরোধী কাজ করে গেছে। ফলে রাজ্যের জনগণ থেকে সিপিএম আজ বিচ্ছিন্ন এবং শ্রমিক-কৃষক-গরীব মানুষ আজ সিপিএম বিরোধী। বাঘ রক্তের স্বাদ পেয়েছে। ক্ষমতার মধু পেয়ে বামপন্থীদলগুলি আদর্শহীন ক্ষমতাভোগীতে পরিণত হয়েছে। জনগণের সঙ্গে বঞ্চনা করেছে। আর এই তিন দশকের রাজত্বের মধ্যে দু'দশক ধরে রাজ্য-মন্ত্রিসভার মধ্যমণি ছিলেন জ্যোতি বসু। আর তাঁকে সমর্থন করে গেছেন হরকিষেণ সিং সুরজিৎ-এর নেতৃত্বে সিপিএম-এর পলিটব্যুরো। সুতরাং দু'দশকের অপকীর্তির নায়ক ছিলেন— জ্যোতি বসু। তাই তাঁর নামে কোনও নগর প্রতিষ্ঠা করা অন্যায়। সেই নগরের নামকরণ হওয়া উচিত হলো— ''রবীন্দ্রনগর'' অথবা ''শহীদ'' নগর।

সিপিএমের আর এক পলিটব্যুরো সদস্য তথা শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন এক লেখাতে বলেছেন যে, শিল্পনীতি তথা সিঙ্গুর -নন্দীগ্রাম নীতিই পার্টির বিপর্যয়ের কারণ। তিনি আরও বলেছেন যে শুক্‌নো কথায় পার্টিকে সক্রিয় করা যাবে না।

সিপিএম রাজ্য-কমিটি, নির্বাচন-এর কাজে পার্টিকে এখন থেকেই কাজে' নামার নির্দেশ জারি করেছে। বুথ ভিত্তিক স্ক্রুটিনি এবং প্রচার কর্মসূচীতে জোর দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এইসব কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে সিপিএমের ''গ্রাম দখল'' চলছে।

পাল্টা হিসেবে তৃণমূলও সিপিএম-এর মতো ঠিক এইসব কাজ করে চলেছে। এদিকে মেট্রো-রেলের ব্যবস্থা আজ বিপর্যস্ত। রেলমন্ত্রীর সূত্রে বলা হচ্ছে— ''অন্তর্ঘাত''। রেলমন্ত্রী এক বক্তৃতায় বলেছেন, এ-সব ঠিক হয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল ক্ষমতায় এলে। ''রেলমন্ত্রীর যথাযথ যথেষ্ঠ নিরাপত্তার অভাব রেখেছে রাজ্য প্রশাসন''— এই কথা ঘোষণা করে রেলওয়ে প্রটেকশন ফোর্স রাজ্যপ্রশাসনের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে। পাল্টা সিপিএম পরিচালিত সরকার রাজ্য পুলিশকে নিজের মতো সাজিয়ে চলেছে।

নির্বাচনের প্রচার শুরু হলেই দুই যুযুধান শক্তির সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। দুর্দশা ভোগ করেছেন এবং করবেন সাধারণ মানুষ— গ্রামের মানুষ। সিপিএম-এর নেতৃত্ব প্রবঞ্চনা করেছেন সেইসব পার্টিকর্মী নেতাদের যাঁরা ১৯৬২ থেকে ১৯৬৪-৬৬ পর্যন্ত কারাগারে কষ্ট ভোগ করে আজও উপেক্ষিত এবং দল বিপ্লবের ধোঁকা দিয়ে কংগ্রেসকে বারবার সমর্থন করে এবং দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের সেবাদাসের কাজ করেছে। সিপিএম পরিচালিত সরকার জনগণকে বঞ্চিত করেছে— খাদ্য-আবাসন-স্বাস্থ্য-শিক্ষা-এর কোনও সুব্যবস্থা না-করেই। অত্যাচার করেছে কৃষকদের, দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের স্বার্থে জমি দখল করে।

সিপিএম-প্রবঞ্চক, এবং বঞ্চনার প্রতিভূ! দুর্নীতির পাঁকে নিমজ্জিত।

এ-দিকে রাজ্যে তৃণমূল এবং কংগ্রেস-এর মধ্যে সংঘর্ষের পূর্বাভাস দেখা যাচ্ছে। তৃণমূল নেত্রী বলেছেন কংগ্রেস-কর্মী নিহত হলে কংগ্রেস ব্যবস্থা নিত। কিন্তু তৃণমূলকে সাহারা দিচ্ছে না। নেত্রী বার বার কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রত্যাহারের দাবি তুলছেন।

সিপিএম তিনদশক ধরে যে সব অপ-গুণ (দোষ) অর্জন করেছে—তৃণমূলের নীচের তলায় ইতিমধ্যে সেইসব লক্ষণগুলি প্রকট হয়ে উঠছে। ইতিমধ্যে তৃণমূল নিজেদের সরকারি দল এবং অন্যদেরকে বিরোধী দল হিসাবে গণ্য করে হেয় করা হেনস্থা করার পথে চলছে। অথচ বিজেপি সমেত জোট না করলে সরকার না-গড়লে— ব্যর্থ হবে সিপিএম-বিরোধী মঞ্চ।

এই সময়

লেসার নির্দেশক বোমা

ভারত তার প্রথম লেসার নির্দেশক বোমাটির (লেসার গাইডেড বোম) সফল পরীক্ষা করতে সমর্থ হলো। এই বোমাটি অন্য যে কোনও বোমার চাইতে অনেক নিখুঁতভাবে লক্ষ্যবস্তুকে বিঁধতে সমর্থ হবে। দেরাদুন শহরস্থিত ইনস্ট্রুমেন্ট রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট এস্ট্যাবলিশমেন্ট (আই আর ডি ই)-এর কারিগরী সহায়তায় এটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। আই আর ডি ই সম্প্রতি নিরাপত্তা ক্ষেত্রে যে নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে এবং তার ফলস্বরূপ যে আধুনিক ও উন্নততর প্রযুক্তির আমদানী করা হয়েছে, তাকে মূলধন করেই এই লেসার নির্দেশক বোমাটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এমনটাই জানিয়েছেন সংস্থাটির জনসংযোগ আধিকারিক।

অবসরের বয়স

ফরাসী দেশের সাধারণ কর্মীদের অবসরের বয়স ৬০ থেকে বাড়িয়ে ৬২ করেছিল সে দেশের সরকার। ভাবতেই পারেন, সামনেই নির্ঘাৎ ওখানে ভোট। এরাজ্যের বাম সরকার টাইপের সেদেশের সরকার বোধহয় ভোটের আগে ওই যাকে বলে স্টান্টবাজি, তাই দিল বোধহয়! খুব বিচ্ছিরি রকমের ভুল ভাবছেন। এদেশে আন্দোলন করা হয় অবসরের বয়স বাড়ানোর জন্য আর সেদেশের কর্মীরা বেজায় চটে গেলেন বেমক্কা অবসরের বয়স বাড়িয়ে দেওয়ায়। যার কোপে পশ্চিম ফ্রান্সের বিভিন্ন জায়গায় কিছুদিন চলল বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পে ধর্মঘট। সপ্তাহখানেক ধরে ধর্মঘট চলার দরুণ পেট্রোলপাম্পগুলো শুকিয়ে একেবারে খটখটে হয়ে যায়। রাস্তায় সার সার দিয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে পেট্রোলের অভাবে। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য! অন্যদিকে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে এয়ারপোর্ট যাবার রাস্তা আটকে দেয় বিক্ষোভকারীরা। প্লেন যাত্রীরা দীর্ঘ পথ হেঁটেই যান এয়ারপোর্টে। রাজধানীর বাইরে এনিয়ে ভাঙচুর চালায় বিক্ষোভকারীরা। ফরাসী সরকারের মেরুদণ্ড কতটা সুদৃঢ় আশা করা যায় তার প্রমাণ মিলবে অচিরেই।

নিরাপত্তা আদান-প্রদান বন্ধ

মার্কিন-বেজিং সম্পর্ক নিয়ে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মধ্যপন্থা বাজারি সংবাদমাধ্যমের কাছে যতই আদিখ্যেতার বিষয়বস্তু হোক না কেন, ঘরে-বাইরে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে সরকার আপাতত চীনের সঙ্গে প্রতিরক্ষা বিষয়ক যাবতীয় আদান-প্রদান আপাতত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল তড়িঘড়ি। ঘটনার সূত্রপাত, গত জুনে জম্মু-কাশ্মীরে 'সামরিক আচরণে'র 'সীমা-লঙ্ঘন' করার 'অপরাধে' উত্তর ভারতের সেনাধ্যক্ষ লেফট্যানেন্ট জেনারেল বি এস জয়সওয়াল-এর ভিসা বাতিল করে দেয় চীন। চীনের আস্পর্দা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে বলে সরব হন ভারতের কূটনীতিকরা। ওঁদের চাপের মুখে বিদেশমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণা জানিয়ে দেন, জম্মু-কাশ্মীর ও অরুণাচল প্রদেশের মতো স্পর্শকাতর এলাকাগুলিকে নিয়ে চীনের আরও সংযত আচরণ করা উচিত। তবে শুধু মুখের কথায় কাজ হবে না বুঝেই নিরাপত্তা সংক্রান্ত আদান-প্রদান বন্ধের সিদ্ধান্ত নিল ভারত।

নষ্ট ভোট

এই প্রতিবেদন লেখার সময় অবধি আফগানিস্তানের মসনদে কে বসবেন তা স্পষ্ট নয়। ২৪৯ সদস্য সংখ্যা বিশিষ্ট আফগান-সংসদের কি হাল হবে তা এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হবার আগেই পাঠক জেনে গেলেও তাঁদের জন্য চমকপ্রদ একটি তথ্য ইতিমধ্যেই সংবাদ মাধ্যমের হাতে এসে পৌঁছেছে। জানা গিয়েছে মোট ভোটদানের কুড়ি শতাংশ (প্রায় ১৩ লক্ষ ভোট) জাল বা চিটিংবাজি (ফ্রড) করার অভিযোগে বাতিল করা হয়েছে। ভোটগুলো সরকারপক্ষে না বিরোধীপক্ষে গিয়েছিল তা জানা সম্ভবপর হয়নি। এর পেছনে জেহাদীগোষ্ঠীর হাত আছে কিনা তা নিয়েও চলছে বিশেষজ্ঞদের নিরন্তর গবেষণা। তবে সবকিছু ছাপিয়ে যে প্রশ্নটা উঠে আসছে তা হলো— ভোট-বাতিলের দেশে সাধারণ নির্বাচনে দেশের জনগণের রায় সঠিকভাবে প্রতিফলিত হবে তো?

কাসভের নয়া আবদার

ভারতবর্ষের সরকার-বাহাদুরের তত্ত্বাবধানে ২৬/১১-য় অভিযুক্ত আজমল কাসভের দিনগুলো সুন্দরভাবে অতিবাহিত হবার বিনা-অতিরঞ্জিত সংবাদ আপামর ভারতবাসীর কর্ণগোচর হয়েছে। তাতে তাঁদের 'সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ' গোছের বিস্ময় যতই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাক না কেন, এতে যে কেন্দ্রের কিছু আসে যায় না এহেন সন্দেশও ভারতীয়গণ ভালরকমই বুঝেছেন। তবে তাঁদের ক্রমবর্ধমান বিস্ময় বর্তমান সংবাদটির জন্য আরও কিছুটা তোলা রয়েছে। নিজের ফাঁসি সংক্রান্ত শুনানি শুনে মেজাজ হারিয়ে কাসভ থুতু ছিটিয়েছে ক্যামেরার ওপর এবং দাবি করেছে সে যে ভারতীয় জেলখানায় (বুলেট-প্রুফ আর্থার রোড জেল) বন্দী আছে, সেটা খুব বিশ্রী তাই তাকে আমেরিকায় পাঠাতে হবে! এতেই শেষ নয়, এই ফাঁসি সংক্রান্ত শুনানি জিনিসটাও তার খারাপ লাগছে। তাই গত ২০ অক্টোবর থেকে সে শুনানিও বয়কট করছে।

খর্বাকৃতি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার

ইদানীংকালে বুদ্ধিজীবীরা একটা বিষয়ে তাঁদের যাবতীয় বুদ্ধি প্রায় খরচ করে ফেলছেন। বিষয়টা হলো— 'বাঙালীয়ানা কি ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসেছে।' সম্ভবত এই ক্ষয়িষ্ণু বাঙালিয়ানার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই ভারতের বন্যপ্রাণী প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা জানিয়ে দিলেন বাঙালীর অন্যতম গর্ব সুন্দরবনের রাণী রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আকারে ও ওজনে ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। তাঁদের ভাষায়,—'স্মলার অ্যান্ড লাইটার'। পরিচর্যার অভাব এবং বন্যপ্রাণী শিকারীদের দৌরাত্ম্যেই এমন হাল হয়েছে রয়্যাল বেঙ্গলের। কাঠুরেদের প্রতি বঞ্চনাও আর ঢেকে রাখতে পারছে না সরকারী বনদপ্তরের অপদার্থতাকে। তবে আইনি কূট কৌশলের মতোই কেউ কেউ বলতে চেষ্টা করছেন— 'দেখেশুনে মনে হচ্ছে রয়্যাল-বেঙ্গলের উপ-প্রজাতি এরা। আসল রয়্যাল-বেঙ্গল হয়তো নয়।' তাই সত্যিই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আকৃতি এবং ওজনে হ্রাসমান কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট ধ্বন্দে বিজ্ঞানীরা। এটুকুই আশার আলো, অন্তত সুন্দরবনের মানুষের কাছে।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বাক্-স্বাধীনতার আড়ালে রাষ্ট্রদ্রোহিতা

সম্প্রতি দিল্লীতে মাওবাদীদের প্রকাশ্য গণসংগঠন 'কমিটি ফর দি রিলিজ অফ পলিটিক্যাল প্রিজনারস'-এর উদ্যোগে 'আজাদি—একমাত্র পথ'—এই শিরোনামে একটি সেমিনার আয়োজিত হইয়াছিল। এই সেমিনারে বিচ্ছিন্নতাবাদী হুরিয়ত নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানি, মাওবাদী চিন্তাবিদ সুজাতা রাও-এর সুরে সুর মিলাইয়াছেন বুকার ও সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্তা লেখিকা অরুন্ধতী রায়। তাঁহার বক্তব্য, "ভুখে নঙ্গে হিন্দুস্থান সে কাশ্মীর কো আজাদ করো।" পরে শ্রীনগরেও এক সেমিনারে এই বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিয়াছেন, "কাশ্মীর কোনও কালেই ভারতের অংশ ছিল না।... স্বাধীনতার পর ভারত সেনা পাঠাইয়া কাশ্মীর দখল করিয়া লইয়াছে।" বাক্-স্বাধীনতার অধিকারকে ঢাল করিয়া এমন 'হেট ইন্ডিয়া' অভিযানকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ব্যতীত আর কি বলা যাইবে? সন্দেহ নাই, বাক্-স্বাধীনতা গণতন্ত্রে অধিকারবোধকে মজবুত এবং বৈচিত্র্যকে শক্তিশালী করিয়া থাকে। স্বাধীন সমাজের যাহা অন্যতম বৈশিষ্ট্যও বটে। কিন্তু সেইসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে বাক্-স্বাধীনতা তাহাদের হাতে এক ভয়ঙ্কর ধ্বংসাত্মক অস্ত্র হইয়া উঠিতে পারে যাহারা সামাজিক সম্প্রীতি ও জাতীয় সংহতিকে ধ্বংস করিতে চায়। তাই সঙ্গত কারণেই সেমিনারের আলোচ্য বিষয়টি নর্থ ব্লককে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। আলোচনার অন্যতম বক্তা সৈয়দ গিলানি সংসদ ভবন আক্রমণের মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন। প্রশাসনিক দুর্বলতা অর্থাৎ উপযুক্ত তথ্যাদি পেশ না করিবার জন্য তিনি অব্যাহতি পাইয়া যান। তাহার পাক-পন্থী তথা ভারত-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর কথা সকলেরই জানা। কিন্তু আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি স্বাধীন কাশ্মীরের জন্য যুদ্ধ করিবার ডাক দিয়া অরুন্ধতী রায় বিষয়টিতে একটি অন্য মাত্রা যোগ করিয়াছেন। ইতিপূর্বেও তিনি জাতির শত্রুদের এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সন্ত্রাসবাদীদের নির্লজ্জভাবে উৎসাহ দিয়াছেন। অমরনাথ যাত্রা বিরোধী অভিযানে শ্রীনগরে গিয়া তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের গলায় গলা মিলাইয়া স্বাধীন কাশ্মীর গঠনের দাবীকে সমর্থন করিয়াছেন। 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নিরীহ বলি' হিসাবে তিনি মাওবাদীদের চিত্রিত করিয়াছেন এবং মাওবাদীদের দ্বারা নিহত নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের প্রতি কোনওরকম সমবেদনা প্রকাশ তো দূরের কথা, বরং সংকীর্ণ স্বার্থপর আনন্দে উল্লসিত হইয়াছেন। যদি প্রধানমন্ত্রীর কথা মতো বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসবাদীরা দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সর্বপ্রধান বিপদ বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে বন্দুকধারী হত্যাকারীদের পক্ষে অরুন্ধতী রায়ের মতো যাহারা ওকালতি করিতেছেন, তাহারাও সমানভাবে দেশ ও জাতির পক্ষে ভয়ঙ্কর। তাহারা রাষ্ট্রদ্রোহী।

দিল্লীর এই সভায় এমন সব ব্যক্তিরা আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন যাহারা সরকার কর্তৃক দেশ ও জাতির শত্রু হিসাবে চিহ্নিত। তাই এই সভা আমাদের দুইটি প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করাইয়াছে। প্রথমত, যাহাদের আলোচনা সুস্থ ও মুক্ত চর্চার পথ কোনওভাবেই প্রশস্ত করিবে না— ইহা জানা থাকা সত্ত্বেও কেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক উদ্যোক্তাদের সভা করিবার অনুমতি দিল? বিশেষত যাহারা নর্থ ব্লকের নাকের ডগায় বসিয়াই দেশের ও জাতীর সংহতিকে বিদ্রূপের সঙ্গে উপেক্ষা করিবে? নর্থ ব্লক হইতে সামান্য দূরে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় যে পরিকল্পিতভাবেই সরকারের অবস্থানকে উপেক্ষা করা হইবে দিল্লী পুলিশ ও আই বি-র অফিসাররা তাহা তো সম্পূর্ণরূপেই জানিতেন। তবে? দ্বিতীয়ত, আইন সকলের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। এই ক্ষেত্রে তাই অরুন্ধতী রায়ের বিরুদ্ধে জাতীয়তা-বিরোধী কাজকর্মের অভিযোগে 'আনলফুল অ্যাক্টিভিটিস প্রিভেনশন অ্যাক্ট'-এর আওতায় অবিলম্বে মামলা দায়ের করা হইবে না কেন? এই একই আইনের ধারায় দোষীদের গ্রেপ্তার করা যাইতে পারে। অরুন্ধতী রায় এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হইতে পারেন না।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

প্রকৃত ধার্মিক কিনা তাহার স্বভাব দ্বারাই বিচার করা যায়। প্রকৃত ধার্মিকেরা বিনয়ী। রোমের 'পোপ' একবার দেখিলেন বহুলোক একটি স্ত্রীলোকের নিকট যাইতেছে। ওই স্ত্রীলোকটির উপর নাকি খৃস্টের ভর হইয়াছিল বলিয়া প্রচার। পোপ অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। তাঁহার কার্ডিনেল বলিলেন—"আমি পরীক্ষা করিয়া আসিতেছি।" তিনি ওই স্ত্রীলোকটির নিকট গিয়া বলিলেন, "আমার জুতাটি খুলিয়া দাও।" স্ত্রীলোকটি ওই মতো করিল না বরং তাহার ব্যবহারে দর্শকমণ্ডলী আশ্চর্য হইলেন। কার্ডিনেল এই ব্যবহার দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং আনুপূর্বিক জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন—ও ভণ্ড। ধার্মিক হইলে বিনয়ী হইতেন, আমার কথানুযায়ী কার্য করিতেন।

—শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

অযোধ্যা মামলার রায়

শান্তির চেয়েও সত্য বড়

এন সি দে

অযোধ্যা রামমন্দির নিয়ে যে বিতর্ক ও মামলা চলছে ১২৫ বছর ধরে তার অবসানে হিন্দুস্থানের সত্যনিষ্ঠ মানুষ উল্লসিত। এই ধরনের কোটি কোটি মানুষের কাছে সত্যের প্রতি নিষ্ঠা রক্ষা করাই শ্রেষ্ঠ, মিথ্যার প্রতি নিষ্ঠা দেখিয়ে শান্তি রক্ষা নয়। শাসক শ্রেণী ও তাদের আশ্রিত অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের কাছে সত্যের চেয়েও শান্তি স্থাপন শ্রেষ্ঠ কারণ সেই শান্তি রাজনৈতিক শান্তি। এখন প্রশ্ন হলো পৌরাণিক বিশ্বাসের প্রতি নিষ্ঠাই সত্য, না কি শাসক শ্রেণীর আশ্রিত ইতিহাসবিদের লেখা ইতিহাস সত্য?

আমাদের স্বদেশের ইতিহাস সম্পর্কে আক্ষেপ করে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা আমাদের চিরন্তন স্বদেশকে আমাদের দেশের ইতিহাসের মধ্যে খুঁজে পাই না। বাল্যকালে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই মানুষ তাদের দেশের পরিচয় পায়। আমাদের ঠিক তার উল্টো। দেশের ইতিহাস বইগুলিই বরং আমাদের প্রকৃত স্বদেশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এ দুর্ভাগ্যের কারণ আমাদের প্রচলিত ইতিহাস স্বদেশের হৃদয়সম্ভূত নয়, যেসব ইউরোপীয় পণ্ডিত ভারতের ইতিহাস রচনা করেছেন, তাদের অধিকাংশই ভারতবর্ষকে কখনও প্রত্যক্ষ করেননি। ভারতবর্ষের ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনচর্চা সম্পর্কে যারা কিছুই জানে না, তারাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের স্রষ্টা। এই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের লেখা ইতিহাস আমাদের এমনস্থানে আলো ফেলে যেখানে প্রকৃত ভারতবর্ষ নেই; প্রকৃত ভারতবর্ষ আছে অন্ধকারে আবৃত।'

কবিগুরুর মতে, "ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করে পরীক্ষা দিই, তা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্নকাহিনী মাত্র। কোথা থেকে কারা এল, কাটাকাটি মারামারি করল, বাপে-ছেলেয়, ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন নিয়ে টানাটানি করল, একদল যদি বা যায় কোথা থেকে আর একদল এসে পড়ে; মোগল-পাঠান-পর্তুগীজ-ফরাসি ও ইংরেজদের এই রক্তবর্ণে রঞ্জিত ইতিহাস ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। যেন ভারতবাসী নাই, কেবল যারা কাটাকাটি খুনোখুনি করেছে, তারাই আছে।" এই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কটাক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "ভারতীয় রাষ্ট্রীয় দফতর হইতে রাজবংশমালা ও জয়-পরাজয়ের কাগজপত্র না পাইলে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া পড়েন এবং বলেন যেখানে পলিটিক্স নাই সেখানে আবার হিস্ট্রী কিসের, তাঁহারা ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না।"

এইসব পাশ্চাত্য পণ্ডিতরাই সুকৌশলে পরাধীন জাতির আত্মবিস্মৃত মানুষদের মনেও এ বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিতে পেরেছিলেন যে, ভারতবর্ষের কোনও ইতিহাস নেই। এই মূর্খ এবং ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন পাশ্চাত্য প্রবরদের কটাক্ষ করে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "বিলাতী বিদ্যার লক্ষণ এই যে, তাঁহারা স্বদেশে যাহা দেখেন, মনে করেন বিদেশে ঠিক তাহাই আছে। তাঁহারা ত্তম্পম্পক্ত ভিন্ন অগৌরববর্ণা কোনও জাতি জানিতেন না, এ জন্য এদেশে আসিয়া হিন্দুদিগকে ত্তম্পম্পক্ত বলিতে লাগিলেন। সেইরূপ স্বদেশে ড্রম্মন্ত কাব্য ভিন্ন পদ্যে রচিত আখ্যান গ্রন্থ দেখেন নাই, সুতরাং য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা রামায়ণ মহাভারতের সন্ধান পাইয়াই এই দুই গ্রন্থ ড্রম্মন্ত কাব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। যদি কাব্য তবে আর উহার ঐতিহাসিকতার কিছু রহিল না। সব এক কথায় ভাসিয়া গেল।"

এইসব পাশ্চাত্য পণ্ডিতপ্রবরদের মতে, রামায়ণ, মহাভারত যেহেতু শুধু কাব্য, সেইহেতু এগুলির রচয়িতা ব্যাস, বাল্মীকিরা শুধুই কবিমাত্র, কিন্তু এরা জানে না ব্যাস, বাল্মীকি রচিত গ্রন্থগুলিই ভারতবর্ষের ইতিহাস। শুধুমাত্র রাজনৈতিক ইতিহাস নয়, ভারতবর্ষের শতসহস্র বৎসরের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ইতিহাস বিধৃত আছে পুরাণসমূহে। বেদসংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহ ভারত ইতিহাসের মূল্যবান আকর।

বর্তমান রামমন্দির বিতর্কে স্বদেশের মানুষ কী বিদেশীদের লেখা এই ইতিহাসকে নিষ্ঠার সঙ্গে সত্য বলে গ্রহণ করবে? না কি রামায়ণে বর্ণিত শ্রীরামের প্রতি বিশ্বাসকে নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকড়ে থাকবে? হিন্দুস্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস, আবেগ ও নিষ্ঠার কী কোনও মূল্য নেই? যেহেতু তারা উদার, সহিষ্ণু ও মানবিক, হিন্দু ধর্মের এই উদারতা, সহিষ্ণুতা ও মানবিক পরিবেশে কিছু আগাছারও জন্ম হয় খুব সহজেই। অহেতুক উদারতা, সহিষ্ণুতা ও মানবিকতা প্রকাশ তাদের রাজনৈতিক চালমাত্র। এই গুণগুলি এদের কাছে কেবলই কুকার্য উদ্ধারের বুলি। এই উদারতা, সহিষ্ণুতা ও মানবিকতার বুলি আউড়ে এই সকল মানুষেরা সত্যকে আড়াল করতে চায়। সত্য কখনও ইতিহাস আশ্রিত নয়, সত্য শাশ্বত সনাতন। শান্তির স্বার্থে তা বিসর্জন দেওয়া যায় না। যে সত্যবাদী উগ্রতার সঙ্গে তার সত্যবাদীতা জাহির করে, সে যেমন প্রকৃতপক্ষে সত্যবাদী নয়, ঠিক তেমনি এই উগ্রশান্তিবাদীরা প্রকৃতপক্ষে হয় ধান্দাবাজ, নয় ভীরু, কাপুরুষ। তারা আজ সত্য প্রকাশে আতঙ্কিত হয়ে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করছে। সত্যকে ভয় পাচ্ছে, তাই আড়াল করতে চাইছে। আদালতের কাজ ন্যায়-বিচার, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা নয়। এই কাজ সরকারের। অশান্তির ভয়ে যদি আদালতকে বাধ্য করা হয় সত্য-বিচার বা সত্য প্রকাশ না করতে, তাহলে তো সমস্ত পেশী শক্তিসম্পন্ন হিংসাশ্রয়ীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই গ্রহণ সম্ভব হবে না। সমাজে হিংসাশ্রয়ীরাই দাপিয়ে বেড়াবে।

ভারতীয় কংগ্রেস দলের ইতিহাস এই হিংসাশ্রয়ীদের তোষামোদ করারই ইতিহাস। ১৯১৯ সালে সৃষ্ট খিলাফত আন্দোলন, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, যা ছিল মূলতঃ প্যান-ইসলামিক অর্থাৎ বিশ্ব মুসলিম ঐক্য গড়ে তোলার প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়। এমনকী মহম্মদ আলি জিন্নাও প্রথমদিকে এই আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর মতে, এই আন্দোলনের ফলে প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লারা প্রাধান্য পাবে এবং ভারতীয় মুসলমানদের জাতীয়তাবোধও শিথিল হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের হলেও সত্যি যে ১৯১৯ সালের ২৩ নভেম্বর দিল্লীতে যে সর্বভারতীয় খিলাফত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে গান্ধীজীই সভাপতি ছিলেন। পরের ইতিহাস সকলেরই জানা। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীলরাই প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। পরিণামে কেরলে মোপলাদের খেপিয়ে তোলা হয়েছিল নিরীহ হিন্দুদের বিরুদ্ধে। মোপলা মুসলিম মোল্লাদের হাতে সেদিন লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারী ধর্ষিতা, গৃহহারা ও খুন হয়েছিল। এই মুসলমানরাই পরে রক্তের স্বাদে মত্ত হয়ে মুসলিম লীগের ব্যানারে হিংস্রতার ভয় দেখিয়ে এই অহিংসা আর শান্তিবাদীদের দৌলতে ভারতমাতাকে দ্বিখণ্ডিত করেছিল। এই শান্তিবাদীরা সেদিনও শান্তি স্থাপন করেছিল খণ্ডিত সত্যের বিনিময়ে। কাশ্মীর প্রশ্নেও কংগ্রেস আজও সেই কাপুরুষোচিত শান্তিবার্তা নিয়ে রক্তের স্বাদ পাওয়া হিংস্র জনগোষ্ঠীর কাছে ঈদের উপহারের ডালি নিয়ে হাজির হচ্ছে। আজ যদি ভারতবর্ষে বিজেপি-র মতো দল না থাকতো, তাহলে জম্মু-কাশ্মীরকে এই মোল্লাদের হাতে তুলে দিয়ে আর একটা কাপুরুষের শান্তি স্থাপন করে ফেলত।

আর শান্তির আকাঙ্ক্ষা নয়, চাই যে কোনও উপায়ে হিংস্রতার মূলোচ্ছেদ করে সত্য প্রতিষ্ঠা। হিংসাশ্রয়ীদের বুঝিয়ে দিতে হবে আর অশান্তির ভয়ে মিথ্যাকে আশ্রয় করে বাঁচা নয়—সত্যের বিনিময়ে সাময়িক অশান্তিকে আমরা ভয় পাই না। যে কোনও উপায়ে সত্যকে নিয়েই এদেশ বাঁচবে। ভীরুতা, কাপুরুষতাকে নিয়ে নয়।

"শান্তির আকাঙ্ক্ষা নয়, চাই যে কোনও উপায়ে হিংস্রতার মূলোচ্ছেদ করে সত্য প্রতিষ্ঠা। হিংসাশ্রয়ীদের বুঝিয়ে দিতে হবে আর অশান্তির ভয়ে মিথ্যাকে আশ্রয় করে বাঁচা নয়—সত্যের বিনিময়ে সাময়িক অশান্তিকে আমরা ভয় পাই না। যে কোনও উপায়ে সত্যকে নিয়েই এদেশ বাঁচবে। ভীরুতা, কাপুরুষতাকে নিয়ে নয়।"

মোহনরাও ভাগবতের বিজয়া দশমীর ভাষণ

হিন্দুত্বই বিশ্বশান্তির জন্য একান্ত আবশ্যক

(১ পাতার পর)

এবং ব্যক্তির ছবি হিসেবে প্রথম ছবিই হলো শ্রীরামচন্দ্রের। গুরু নানক দেব ১৫২৬ সালেই সারা ভারত ভ্রমণের সময় শ্রীরামজন্মভূমি দর্শন করেছিলেন। একথা শিখ সম্প্রদায়ের ইতিহাসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক, পুরাতাত্ত্বিক তথা প্রত্যক্ষ খনন করে যে সকল সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়েছে তার ভিত্তিতে ১৫২৮-এর আগে শ্রীরামজন্মস্থানে কোনও পবিত্র হিন্দু মন্দিরের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

নিয়তি প্রদত্ত সুবর্ণসুযোগ

শ্রীরামজন্মভূমি সম্পর্কিত আদালতের বিচার-প্রক্রিয়া ৬০ বছর যাবৎ টেনে নিয়ে যাওয়ার ফলে সম্পূর্ণ সমাজে একাত্মতার ক্ষেত্রে বিভেদের বিষ, সংঘর্ষ, কটুতা এবং কষ্টদায়ক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এই অকারণ বিবাদ সমাপ্ত করে আমাদের রাষ্ট্রীয় মান-মর্যাদার প্রতীক মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যাস্থিত জন্মভূমিতে এক সুরম্য সৌন্দর্যমণ্ডিত শ্রীরামমন্দির তৈরির জন্য সকলেরই পুরনো কথা ভুলে একত্রিত হওয়া উচিৎ। এটা এদেশের মুসলমানসহ সকল শ্রেণীর মানুষের আত্মীয়তাপূর্বক মিলেমিশে এক নতুন দিক শুরু করার জন্য দৈব প্রদত্ত সুবর্ণ সুযোগ। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ একথাই বিশ্বাস করে। সংকীর্ণ ভেদাভেদ, পূর্বাগ্রহ থেকে সৃষ্ট জেদাজেদি, সংশয়ের মনোভাব পরিত্যাগ করে মাতৃভূমির প্রতি উৎকট অব্যভিচারী ভক্তিভাব, একই পূর্বপুরুষের পরম্পরার প্রতি সম্মান, সকল রকমের বিবিধতার মান্যতা, সুরক্ষা ও সমান সুযোগ প্রদানকারী, পৃথিবীর মধ্যে অনুপম একমেবাদ্বিতীয়ম্, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং সর্বসমাবেশক ও সহিষ্ণু আমাদের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে হবে। স্বর্গীয় লোহিয়াজীর ভাষায় উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে একাত্মতার সংযোজক শ্রীরামচন্দ্র। তাঁর জন্মভূমিতে মন্দির তৈরির জন্য সকলকে একজোট হতে হবে। এটাই সারা সমাজের আকাঙ্ক্ষা। ৩০ সেপ্টেম্বর আদালতের রায় বের হওয়ার পর সমাজ যে একতা ও সংযমের পরিচয় দিয়েছে তা থেকে এই আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট।

ষড়যন্ত্রকারীদের থেকে সাবধান

আদালতের রায় বেরনোর পরদিন থেকেই রাষ্ট্রীয় একাত্মতার জন্য প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে এটাকে নিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে ভোটব্যাঙ্ক কেন্দ্রিক তুষ্টীকরণ রাজনীতির অপচেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছে বলে দেখা যাচ্ছে। একশ্রেণীর মানুষ এদেশের মত-পন্থ, প্রদেশ, ভাষা প্রভৃতি বিবিধতার সুযোগ নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যেই পরস্পর লড়িয়ে দিয়ে ভোট কুড়োবার ব্যবস্থা করে। আবার তারা নিজেরা মুখে সেকুলারইজমের জয়জয়কার করে বড় বড় কথা বলে সূক্ষ্মভাবে পারস্পরিক সামাজিক সদ্ভাব বিঘ্নিত করছে। এভাবেই সামাজিক সদ্ভাবও একাত্মতা নির্মাণের পথে বাধা দিতে থাকে। একশ্রেণীর মিডিয়া এবং তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা বিভ্রান্ত চিন্তাধারা ও অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে হিন্দু আদর্শবাদ এবং হিন্দুদের তাবৎ বিষয় সম্পর্কে পূর্ব ধারণা মতো বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করেন। এঁরা নিজেদের ব্যাবসায়িক স্বার্থরক্ষার জন্য সত্য-মিথ্যার তোয়াক্কা করেন না—'ন ভয়ং ন লজ্জা'। যদি গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১০ বিকেল চারটায় 'রায়' আসার আগে পর্যন্ত তাদের মুখের ভাষা এবং রায় আসার পরের ভাষা একটু খেয়াল করে থাকেন তাহলেই তা বোঝা যাবে। সমাজে বসবাসকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ভীতি এবং অবিশ্বাসের অহেতুক বিভ্রান্তির পরিবেশ তৈরি করে এরা সদাসর্বদা সেকুলারইজমের আলখাল্লা পরে কুটিল ও কুতর্কের কাজ চালিয়ে যান। এরকম সকলের থেকে সাবধান থাকার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। এঁরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমাজে বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সমতা, শোষণমুক্তি প্রভৃতি বড় বড় কথা বলেন আর তার আড়ালে নিজেরাই এসবের বিরুদ্ধে কাজ করে সমাজের বিকাশে বাধা সৃষ্টি করেন।

এরকমই স্বার্থ ও বিদ্বেষের কারণে কিছু সন্ত্রাসী ঘটনায় হাতে গোনা কতিপয় হিন্দুর সংশ্লিষ্টতাকে 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ', 'গৈরিক সন্ত্রাস' শব্দ প্রয়োগ করা হচ্ছে। এতে রাষ্ট্র-বিনাশী দেশঘাতক ষড়যন্ত্রের আভাস স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রেও সঙ্ঘকে সংযুক্ত করার অপচেষ্টা রয়েছে। মিথ্যার মায়াজালে জনগণকে বিপথচালিত করে হিন্দু সন্ন্যাসী, সজ্জন, মঠ-মন্দির এবং হিন্দু সংগঠনকে বদনাম করার অপচেষ্টা কাদের ইঙ্গিতে চলছে, কারা লাভান্বিত হচ্ছে— তা জানার আমরা কোনও প্রয়াসই করিনি। এইসব লোকেরা যে দেশ ও জাতিকে (Nation) অপযশ ও সংকটের মধ্যে ফেলবে এটা একপ্রকার নিশ্চিত করে বলা যায়।

'গৈরিক' আমাদের দেশের সংবিধান সম্মত জাতীয় পতাকার শীর্ষে বিরাজমান এবং ত্যাগ, কর্মশীলতা ও জ্ঞানের প্রতীক। নিজেরা সন্ত্রাসী প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত থেকে সন্ত্রাসের সঙ্গে সতত সঙ্ঘর্ষরত হিন্দু সমাজ, সাধু-সন্ত, সন্ন্যাসিনীদের ভারতবর্ষ। প্রত্যেক প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং যুদ্ধকালীন সময়ে মনুষ্যকৃত বিপদ-বিপত্তিতে শাসন-প্রশাসন এবং জনসাধারণের সেবা-সহায়তায় সদা সচেষ্ট থাকেন সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা। তাঁরা দেশজুড়ে সবরকম স্বার্থ ও ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ছোট-বড় সেবা-প্রকল্প চালাচ্ছেন। সেই সঙ্ঘ, স্বয়ংসেবক এবং অন্যান্য সংগঠনকে কলঙ্কিত করার অপচেষ্টা অবশ্যই বিফল হবে। আদালতের মাধ্যমে অভিযোগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগেই প্রচার-মাধ্যমের দ্বারা ভুল তথ্য পরিবেশনের (dis-information compaign via media trials) আগে নিজেদের দিকে ভালোভাবে দেখে নিন। এসব লোকেরা 'গৈরিক সন্ত্রাস' শব্দ প্রয়োগ করে ভারতের শ্রেষ্ঠ পরম্পরা, সন্ত-মহাত্মাদের অপমান করতে কোনও কসুর করেন না। এখন দেশকে সংকীর্ণ নির্বাচনী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ষড়যন্ত্রের দিকে ঠেলে দেওয়ার সময় নয়।

চীন ঃ এক গম্ভীর চ্যালেঞ্জ

গায়ের জোরে তিব্বত দখল করার পর তা সিদ্ধ করার জন্য চীন তিব্বত-সমস্যা ও কাশ্মীর-সমস্যাকে এক করে দেখতে শুরু করেছে। তার প্রমাণ হিসেবে সসৈন্যে ভারতীয় কাশ্মীরের পাক দখলীকৃত গিলগিট ও এবং বালটিস্থানে উপস্থিত হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীর এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের ভারতীয়দের চীনে ঢোকার জন্য ভিসার কোনও প্রয়োজন নেই— একথা বলে চীন ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছে। চীনের এই মতিগতির ব্যাপারে কারও কোনওরকম অস্পষ্টতা থাকার কারণ নেই। ভারতকে ঘিরে ফেলার জন্য, দমিয়ে রাখার জন্য, দুর্বল করার জন্য চীনের সামরিক রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক প্রয়াস সকলের চোখের সামনে বিদ্যমান। এজন্য আমাদেরও সামরিক, রাজনৈতিক এবং ব্যবসায়িক ব্যুহরচনা শক্তিশালী, ফলদায়ী হওয়া দরকার। সরকারকে এবিষয়ে সতর্ক সজাগ থাকা এবং সমাজের মনস্থিতি তৈরিতে দ্রুত মনযোগ দেওয়া ও কার্যকরী করা দরকার। এব্যাপারে দেরি করলে দেশের পক্ষে ভবিষ্যতে গম্ভীর বিপদকে ডেকে আনার সামিল হবে।

নকশালী সন্ত্রাস

চীনের সমর্থনেই নেপালে মাওবাদীদের উপদ্রব তৈরি হয়ে বিশাল আকার ধারণ করেছে। নেপালের ওই মাওবাদীদের সঙ্গে ভারতবর্ষের মাওবাদী সন্ত্রাসের যোগাযোগ রয়েছে। এই সন্ত্রাসীদের দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করার ব্যাপারে সরকার নিজেদের ভিতরেই বাদ-বিবাদে ব্যতিব্যস্ত। প্রশাসনকে দক্ষ এবং জবাবদিহি করার মতো গড়ে তোলা, মাওবাদী প্রভাবিত অঞ্চলে অতি দ্রুত উন্নয়ন কর্মসূচী পালিত হওয়া দরকার। কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যাচ্ছে না। কোথাও কোথাও এই সমস্যাকে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। দেশের সুরক্ষা এবং গণতন্ত্রের জন্য এই অপব্যবহারের কঠোর মূল্য দিতে হবে।

উত্তর পূর্বাঞ্চল ঃ দেশভক্তদের উপেক্ষা

উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিষয়ে একথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওখানেও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রশ্রয়দান এবং দেশের প্রতি নিষ্ঠাবানদের উপেক্ষা করা হচ্ছে। এজন্যই জনসমর্থন হারিয়ে প্রায় দুর্বল হতে থাকা এন এস সি এন-এর মতো বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী সংগঠন আবার মাথা তুলে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্তের রক্ষক ও চীনের আস্ফালন মোকাবিলার হিম্মত দেখানো অরুণাচল প্রদেশের প্রতি উপেক্ষা চলছেই। মণিপুরের স্বদেশপ্রেমিক জনগণ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দীর্ঘদিন ধরে প্রধান সড়ক অবরোধের ফলে জীবনদায়ী জিনিসপত্রের অভাবে একপ্রকার মাথা খুঁড়েছে। অবরোধ মুক্ত করার জন্য আবেদন নিবেদন করতে করতে অবসন্নপ্রায়। নিরাশার ফলে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। নিজের দেশেই দেশভক্তদের উপেক্ষা আর বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অকারণে আশ্রয়-প্রশ্রয়-তোষামোদ করা চলছে। ফলে ওই এলাকায় চীনের বিস্তারবাদী যোজনার ছায়া কতটা দীর্ঘায়িত হবে, সীমান্ত রক্ষা ব্যবস্থা কতটা বিঘ্নিত হবে— তার কল্পনা কি আমাদের নেতারা করতে পারছেন না? বিদেশী খৃস্টান মিশনারীদের ষড়যন্ত্র এবং উপদ্রবের প্রতি লাগাতার উপেক্ষা করা হচ্ছে। ফলে দিনদিন পরিস্থিতি গম্ভীর হচ্ছে।

তোষামোদের রাজনীতি ঃ এক বড় বিপদ

একদিকে সরকার ও প্রশাসনের অবস্থা যেন অন্ধকার নগরীর রাজার মতোই ইচ্ছাশক্তিহীন গয়ংগচ্ছ মনোভাব। অপরপক্ষে, স্বাধীনতার ৬০ বছর বাদেও সীমান্তের শতছিদ্র অবস্থার কারণে প্রতিনিয়ত বাংলাদেশ থেকে বিরামহীন অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে। আদালত এবং গোয়েন্দা বিভাগ বার বার সতর্ক করে বলে চলেছে— Detect, Delete, Deport, তবুও অনুপ্রবেশকারীদের Detect বা চিহ্নিত করার মতো ইচ্ছাশক্তি বা দৃঢ়তা কেন্দ্র বা রাজ্যের নেতারা নির্বাচনী ভোটের খাতিরে খুইয়ে বসে আছেন। সর্বত্র এই একই চিত্র। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহ, বাংলা এবং বিহারের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোর জনসংখ্যার ভারসাম্য ও আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা বদলে দিয়েছে অনুপ্রবেশ। ওইসব ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক কট্টরপন্থী মনোভাব বাড়ছে। জনজাতি ও অন্যান্য হিন্দুদেরকে উৎপীড়ন, অত্যাচার, গুণ্ডামি উপদ্রব করার মতো উদ্দণ্ডতা ও দুঃসাহসকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের দেগঙ্গায় হিন্দুদের উপরে ভয়াবহ আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। এটা সীমান্ত সংলগ্ন বিভিন্ন প্রদেশে দেশভক্ত হিন্দুদের উপর কয়েকবছর যাবৎ যে অত্যাচার চলছে তারই এক তাজা উদাহরণ। সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার অথবা ক্ষমতাসীন কেন্দ্র সরকারের এই সন্ত্রাস নিয়ে কোনওরকম মাথাব্যথাই নেই। সকলের দৃষ্টি আপন আপন ভোটব্যাঙ্কের দিকে নিবদ্ধ। আইনশৃঙ্খলার এরকম অবনতি, হিন্দুদের নিরাপত্তাহীনতা সীমান্তবর্তী ক্ষেত্রে দেশের সুরক্ষাকে বিপন্ন তথা আলগা করছে। সরকার ও প্রশাসনের এবিষয়ে সর্বত্র অভিজ্ঞতা বার বার হয়েছে, তবুও পরিস্থিতি একরকম।

দেখেশুনে মনে হচ্ছে, সরকার-প্রশাসন আদৌ এ ব্যাপারে চিন্তিত কিনা! যেভাবে কোনও প্রমাণ ছাড়াই মুখের কথায় এবারকার জনগণনায় নাম নথিভুক্ত হয়েছে তার ফলে এদেশে ঢুকে পড়া যে কোনও অনুপ্রবেশকারীই নাগরিকের তালিকাভুক্ত হবে। এবার সকল নাগরিককে বিশিষ্ট পরিচয়পত্র (Unique Identity Number) দেওয়ার কথা। কিন্তু ওই পরিচয়পত্র যারা পাবেন তারা সকলেই ভারতের নাগরিক কিনা তা যাচাই করার কোনও ব্যবস্থা আছে কি? পরিকল্পনা করার সময়েই এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা, ঢিলেমি অথবা ভুল-চুক হওয়া উচিত নয়।

জন্মগত জাতপাতের পরিচয়-বিহীন একাত্ম সমাজ গঠনের কথা বলা হলেও জনগণনার সময়ে জাতিগত পরিচয় জিজ্ঞাসা করে পুনর্বার জাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা কেন করা হয়েছে? একাত্ম সমাজ রচনার জন্য নিজের পরিচয় হিন্দু, হিন্দুস্থানী অথবা ভারতীয় লেখানো বা বলার জন্য দেশের গণ্যমান্য বিদ্বান ও সামাজিক কার্যকর্তারা আহ্বান জানাচ্ছেন। ঠিক তখন দেশের দায়িত্ববদ্ধ সরকার তার বিরোধিতা করে এক এক জন নাগরিককে তার জাতি কি তা জিজ্ঞাসা করবে? প্রয়োজনে অন্য কোনওভাবে তাৎকালিক ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিসংখ্যান সংকলিত করা সরকারের পক্ষে অসাধ্য বা দুঃসাধ্য নয়।

কথায় ও কাজে স্ববিরোধিতা

দেশকে কোথায় নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছি আর কোথায় নিয়ে যাচ্ছি? দেশের যে সর্বসাধারণ ব্যক্তির উন্নয়নের কথা আমরা বলি, তারা হলো— কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ঠেলায় করে জিনিসপত্র বিক্রি করা, গ্রাম ও শহরের অসংগঠিত শ্রমিক, কারিগর অথবা বনবাসী। কিন্তু আমরা যে আর্থিক নীতি অথবা আমদানি করা পশ্চিমী মডেল নিয়ে চলেছি তার ফলে বড় ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য দিতে দিতে গ্রাম খালি হয়ে যাবে। বেকারত্ব বাড়বে, পরিবেশ বিগড়ে গিয়ে সাশ্রয়ের বদলে খরচ বাড়তে থাকবে। এই পদ্ধতিতে সাধারণ ব্যক্তির কথা, পরিবেশ সংরক্ষণের, বিদ্যুৎশক্তি বাঁচানো, উপার্জনের ব্যবস্থা প্রভৃতি একেবারেই নেই।

একদিকে সকলের জন্য শিক্ষার কথা বলা হচ্ছে, উল্টোদিকে শিক্ষাব্যবস্থার ব্যবসায়ীকরণ করে গরীব লোকেদের জন্য অধিকাধিক শিক্ষাকে দুর্লভ করে তোলা হচ্ছে। আমরা শিক্ষণ সংস্থায় মানবিক মনোভাব, সামাজিক দায়িত্ববোধ, কর্তব্যপরায়ণতা, দেশাত্মবোধ প্রভৃতি সমাজজীবনে প্রভাবী হওয়ার কথা বলি। আর শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে উপরোক্ত গুণাবলীর সংস্কার দেওয়ার বিষয়বস্তুকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। মাথায় ঢোকানো হচ্ছে— "অর্থ, আরও বেশী বেশী অর্থ যে কোনও পথে কামিয়ে নেওয়ার মধ্যেই জীবনের সাফল্য। নিপাট স্বার্থ, ভোগ, জড়বাদ শিক্ষা দেওয়ার পাঠক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক তুলে ধরা হচ্ছে। কথায় ও কাজে এই বৈপরীত্যের মূলে রয়েছে দেশের প্রকৃত বাস্তবিকতা, রাষ্ট্রীয়তা, বৈশ্বিক দায়িত্ব তথা একতার সূত্রসমূহ সম্পর্কে ঘোর অজ্ঞানতা, অস্পষ্টতা অথবা ওই বিষয়ে গৌরববোধের অভাব এবং স্বার্থ ও বিভেদের প্রবৃত্তি। এই অবস্থায় সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে নেতৃত্ব প্রদানকারীদের মধ্যে যোগ্য মনোভাব, চরিত্র, প্রবৃত্তি যেন বর্তমান থাকে। কোনওরকম বিচ্যুতি না হয়। এরকম চিন্তাভাবনা করার মতো সদাজাগ্রত সমাজই এই পরিস্থিতিতে সঠিক দিশা নির্দেশ করতে পারে।

হিন্দুত্ব ঃ অনিবার্য আবশ্যকতা

বিগত ৮৫ বছর যাবৎ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এরকম সমাজ গঠনের জন্য যথোপযুক্ত ব্যক্তি নির্মাণের কাজ করে চলেছে। আমাদের রাষ্ট্র সনাতন। রাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও সুরক্ষার ভিত্তি হলো সমাজের একাত্মতা এবং উদ্যমী পুরুষার্থের নিরন্তর প্রবহমান স্রোত। সারা পৃথিবীর সুখ-শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য অনিবার্য আবশ্যকতা হিন্দুত্ব। বর্তমানে তা সর্বমান্য এবং বেশি করে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে। ২৫ বছর আগে নাগপুরে বিজয়া দশমী উৎসবের এই মঞ্চ থেকেই তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক শ্রী বালাসাহেব দেওরসের বক্তব্য ছিল— ভারতে পন্থনিরপেক্ষতা, সমাজবাদ এবং গণতন্ত্র বর্তমান; কেননা এদেশ 'হিন্দুরাষ্ট্র'। আজ এম জে আকবর, রসিদ আলভির মতো চিন্তাবিদরা সেকথাই বলে লিখে চলেছেন। সবরকম বিবিধতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যবোধ-এর দৃষ্টি প্রদান করে হিন্দুত্ব, তাকে সংরক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত তথা একসূত্রবদ্ধ করে সঞ্চালন করে নিয়ে চলে হিন্দুত্ব। হিন্দুত্বের এই ব্যাপক, সর্বকল্যাণকারী, প্রতিক্রিয়াবিহীন তথা নির্বিরোধ পবিত্র মনোভাবকে কায়মনোবাক্যে ধারণ করে এদেশে বিদ্যমান আছে ভারতমাতার পুত্ররূপ হিন্দু সমাজ। সমাজকে সংগঠিত করা পবিত্র মাতৃভূমি ভারতবর্ষ ও তার গর্বোজ্বল পূর্বপুরুষের পরম্পরা এবং সর্বকল্যাণকারী হিন্দু সংস্কৃতির গৌরব উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা আজকের দিনে বিশেষভাবে আবশ্যক। শুধু আবশ্যকতাই নয় অনিবার্যও। স্বার্থ, ভেদাভেদের কলুষতাকে পরিত্যাগ করে পরমবৈভব-সম্পন্ন পৌরুষযুক্ত দিগ্বিজয়ী সমাজ নির্মাণের জন্য সর্বতো প্রয়াস করতে হবে। আসুন, সারা পৃথিবীকে সমস্যা থেকে মুক্ত করে সুখ-শান্তির পথে অগ্রসর হই। এটাই যাবতীয় সমস্যার সসম্মানে দূরীকরণের একমাত্র পথ, অমোঘ নিদান। নিশ্চিত এবং নির্ণায়ক পন্থা।

এজন্য প্রয়োজন নিত্য শাখায় সাধনার মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তিকে হিন্দুত্বের সংস্কার প্রদান, গৌরবে উদীপ্ত করা। নিঃস্বার্থভাবে, ভেদাভেদ বর্জিত অন্তঃকরণে তন-মন-ধন দিয়ে হিন্দু ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজের জন্য জীবন উৎসর্গের প্রস্তুতি করা। সম্পূর্ণ সমাজকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করার জন্য সংঘকাজ চলছে। এই কাজ করতে থাকা ছাড়া সঙ্ঘের অন্য কোনও বিশেষ আকাঙ্ক্ষাই নেই। প্রয়োজনও নেই। প্রয়োজন কেবলমাত্র এই পবিত্র কাজকে নিজের কাজ মনে করে আপনারা সকলে সহযোগী হিসেবে যুক্ত হোন। এটাই আপনাদের কাছে বিনম্র অনুরোধ এবং আন্তরিক আহ্বান।

রাজ্য রাজনীতি

এদেশের কমিউনিস্টরা আসলে বিদেশী ভাবধারায় তৈরি বনসাই

নিশাকর সোম

এ-রাজ্যের দুই কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিএম এবং সিপিআই)-এর আজ প্রধান সমস্যা হলো পার্টিকর্মীদের উজ্জীবিত করে তোলা। তা' করতে দুই কমিউনিস্ট পার্টির অভিমুখ দু'দিকে।

সিপিআই-এর কর্মীদের সাধারণ সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন পার্টির সাধারণ সম্পাদক এ বি বর্ধন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই সভাতে লোক আনার জন্য হোর্ডিং-পোস্টার দিতে হয়েছিল। কারণ এই রাজ্যে সিপিআই ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর দলে পরিণত হয়েছে।

যাহোক, শ্রীবর্ধন তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন যে কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪২-এর আন্দোলন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং ১৯৪৮ সালে ঐতিহাসিক ভুল করা সত্ত্বেও যে জনসাধারণের সমর্থন পেয়েছিল তার কারণ জনসাধারণের কাছে দোষ স্বীকার করে তারা ক্ষমা চেয়েছিল। এখনও বামফ্রন্ট সরকারকেও তিন দশক ধরে ভুলের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে।

যে কথা শ্রীবর্ধনরা মানতে চাননি, তা'হলো— এই ভুলের কারণ যে সোভিয়েত রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিকে ধ্রুবতারা মনে করে চলা এবং বৃটিশ কমিউনিস্ট নেতাদের অভিভাবকত্বকে মেনে নেওয়া। তাই ১৯৪২-এর আন্দোলনের বিরোধিতার নামে পার্টির তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক পি সি যোশী তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র সচিব ম্যাকসওয়েল-কে ১৯৪২-এর আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তারে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক ঘৃণ্য পত্র পাঠিয়েছিলেন। ওই একই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নেতাজীকে তেজোর কুকুর বানানো এবং কুইসলিং (দেশদ্রোহী) বলতেও তাঁরা দ্বিধা করেনি। কিন্তু যে কথা কমিউনিস্টরা বলেনি— তা' হলো ১৯৪২-এর "কুইট ইন্ডিয়া" আন্দোলনকে সমর্থন করার জন্য তখনকার কমিউনিস্ট নেতা বঙ্কিম মুখার্জি পার্টির মধ্যে বক্তব্য রেখেছিলেন। আর এই কারণে বঙ্কিমবাবুকে কোনওদিনই পার্টি নেতৃত্বের উচ্চ পদে উন্নীত করা হয়নি। এ-কথা বঙ্কিমবাবুর মুখ থেকেই শোনা হয়েছিল। আগের দিনে কমিউনিস্ট পার্টিকে এই বাংলায় বঙ্কিম মুখুজ্জ্যের পার্টি বলা হোত। পরে তা ভবানী সেনের পার্টি এবং ক্রমে জ্যোতি বসুর পার্টিতে পরিণত হয়েছিল। উল্লেখ করা প্রয়োজন, জ্যোতিবাবুর বিধানসভায় (তখন বলা হোত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা) নির্বাচিত হওয়ার মূল কাণ্ডারী ছিলেন বঙ্কিম মুখার্জি। তিনি এবং পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের লালদা— ভূপেন ঘোষ জাল-জুয়াচুরি করে জ্যোতি বসুকে জিতিয়ে আনেন। এর পুরস্কারে (?) বঙ্কিমবাবুকে ১৯৫২-এর পর বিধানসভায় জ্যোতিবাবুর অধীনে সহকারী নেতা করা হয়। বঙ্কিমবাবুকে নিন্দা করা হয়েছিল দেওঘরে অনুকূল ঠাকুরের জন্মোৎসবের সভায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। কমিউনিস্টদের এটাই স্বভাব যে একজনকে নিংড়ে নিয়ে যেই দেখে তিনি মাথা তুলছেন, তখনই তাঁকে ছেঁটে ফেলা হয়।

যাক হোক, সিপিআই কর্মীদের সভায় সাধারণ সম্পাদক ও গুরুদাস দাশগুপ্ত যা বলেছেন তা'হলো—বস্তুত বুদ্ধ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে সিপিএম-এর স্বৈরাচারের ফলেই বামফ্রন্টের এই দুর্দশা।

সমালোচনাগুলি হলো— জেলার স্থানীয় শিল্পের উন্নতি না করে, বন্ধ কলকারখানা খোলার উদ্যোগ না-নিয়ে, দেশী বিদেশী পুঁজিপতিদের তোষণ করে তাদের স্বার্থে চলার-উদ্দেশ্যের কারণ আজ পর্যন্ত জানা গেল না— টাটার সঙ্গে গোপন শর্ত কি ছিল? পাঠক মাফ করবেন— বুদ্ধ-নিরুপম মাফ করবেন— কয়েকজন সাংবাদিক একটি হীরের অলঙ্কার নিয়ে গল্প-গাছা বলে চলেছেন! এটা মিথ্যা হতে পারে?

তবে এটা দেখা যায় টাটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা নিয়ে বুদ্ধ-নিরুপমের মধ্যে তীব্র মনোমালিন্য হয়েছিল। গুরুদাসবাবু এই সভার এবং পূর্বে বহু সভায় বলেছেন, সিপিএম-এর নীতি শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী। তাইতো গুরুদাসবাবু সিটুকে বাদ দিয়ে সর্বভারতীয় স্তরে সকল ট্রেড ইউনিয়ান-এর ফোরাম গঠনে উদ্যোগী হয়েছেন।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, এ-রাজ্যের সিটুর ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন সিপিএম-এর পলিটব্যুরো সদস্য ও সিটু নেতা ডঃ এম কে পান্ধে। বর্তমানে তাই সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এ-রাজ্যের সিটুর উপর সিটুর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তপন সেনের মনিটরিং-এর ব্যবস্থা করেছে।

আসলে কমিউনিস্টদের ক্ষয়ের কারণ তার মূল নীতিটাই ভুল। পরে কার্ল মার্কস তাঁর তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছিলেন মূলতঃ ইংল্যান্ডের অর্থনীতি, গ্রীক দার্শনিকের শ্রেণী সংগ্রাম-এর তত্ত্ব আর অর্থনীতিবিদ রিকার্ডো-কেইনস ইত্যাদির তত্ত্বের উপর নির্ভর করে।—যে তত্ত্ব আজ অকেজো। এ-দেশের কমিউনিস্টরা দেশের মাটিতে বড় হয়নি— বিদেশী নেতাদের তৈরি বনসাই হয়ে থেকেছে। আর যে-নেতাদের 'কৃপায়' পার্টির নীতি তৈরি করা হয়েছিল, সে সব দেশেরই শ্রমিকশ্রেণী কমিউনিস্ট রাজত্বের অবসান ঘটিয়েছে। যেমন পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরি। সোভিয়েত ইউনিয়নকে বেঁধে রাখার জন্য রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ছোট ছোট জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের ভূমিকা সাঁজোয়াগাড়ি চালিয়ে চূর্ণ করেছিল। কিন্তু আজ সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিন্ন ভিন্ন।

এমনকী কিউবার নেতা ফিদেল কাস্ত্রোও বলেছেন যে তাঁর নীতিও ব্যর্থ। তিনি স্বীকার করেছেন দেশের জনগণের চাহিদা মেটাতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন।

চীনে যা চলছে তা হলো বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ন্ত্রিত অনুসরণ। আজ চীনে পশ্চিমী চক্রের আচার-আচরণ-এর উৎকট প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। বিউটি কনস্টেট হচ্ছে, ডেটিং হচ্ছে। এর উপর রাজ্যের নেতাদের পুঁজিবাদী তোষণ ও তাদের বৈভবময় জীবনযাপন তো সকলেই দেখতে পাচ্ছে।

এই কারণেই সিপিএম-এর নিচের তলার কর্মীদের সক্রিয় করতে পার্টি ব্যর্থ। সিপিএম-এর রাজ্য-কমিটির সম্পাদক তথা পলিটবুরো সদস্য বিমান বসু বলেছেন— "নিষ্ক্রিয় সদস্যরা পার্টি থেকে চলে যান।"

প্রশ্ন হলো, তাহলে ব্যর্থ বিমান-বুদ্ধ-নিরুপম-বিনয় কেন দূর হবেন না? এ প্রশ্ন তো সিপিএম-এর নিচের তলার কর্মীদের মধ্যে উঠেছে।

২০১৪-এর পর এরাজ্যে সিপিএম-এর চেহারার ব্যাপক পরিবর্তন হবে। কারণ তখন সারা ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক বৈপ্লবিক অবস্থার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এটা আজ দিবালোকের মতো সত্য যে বিশ্বের কোনও স্থানেই কমিউনিজম নামক বিষয়টি অথবা মার্কসবাদী চিন্তাধারার রেশ নেই। ভারতের কমিউনিস্টদের অভিভাবক বা মুরুব্বি বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টি বহুদিন পূর্বেই দলের নাম পাল্টে র‍্যাডিক্যাল সোসালিস্ট পার্টি করেছে।

শেষ করার আগে একটা কথা বলতে হয়, এদেশের কমিউনিস্টরা অতীতের কর্মীদের অবদান স্বীকার করে না, সম্মান দেয় না। কমিউনিস্টরা অকৃতজ্ঞ। তাই দেবব্রত বিশ্বাস ও কংসারি হালদারের জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁদের স্মরণ করে না। যেমন মূল্য দেয়নি কানু সান্যাল-জঙ্গল সাঁওতালকে। বহিষ্কার করতে দ্বিধা করেনি অশোক মজুমদারকে। ইতিহাস এর প্রতিশোধ নেবেই।

অন্য রকম

ব্যতিক্রমী সত্যেন্দ্রনাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আপনি কি কখনও বাজার থেকে মাছ কিনে নদীতে ছেড়ে দিয়েছেন? শুনতে নিছক 'পাগলামী' মনে হলেও বাস্তবে কিন্তু এইরকম 'পাগল'-এরও সন্ধান পাওয়া যায়। ঠিক যেমন সত্যেন্দ্রনাথ বড়াল। উত্তর কলকাতার এই বাসিন্দাটির বয়স বর্তমানে ৬৯। কিন্তু বয়সের ভারকে তোয়াক্কা না করেই দিব্যি তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর এই অভিনব 'পাগলামী'। রবিবার মানেই সত্যেন্দ্রনাথ বাবুর কাছে একটা বিশেষ দিন। কারণ সপ্তাহের এই দিনটিতেই তিনি চালান তাঁর অভিনব মৎস্য অভিযান।

সত্যেন্দ্রনাথ বড়াল ও খুশবু যুথানী।

রবিবার সকাল হলেই তিনি রওনা দেন বাজারের উদ্দেশ্য। সেখান থেকে প্রায় ১০ কেজির বিভিন্ন মাছ কিনে রওনা দেন ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাবের বিপরীতে চাঁদপাল ঘাটের কাছে। সেখানেই মাছগুলিকে গঙ্গার কোলে মুক্ত করে দেন তিনি। সত্যেন্দ্রনাথবাবুর এই অভিনব অভিযানটি মাছপ্রিয় মানুষদের কাছে বেদনাদায়ক হলেও, তার কাছে অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক। তাইতো বিগত ৩০ বছর ধরে তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন তার এই অভিনব কার্যপ্রক্রিয়া। সত্যেন্দ্রনাথবাবুর কথায় "মাছনদীর সম্পদ। দিনের পর দিন নদীর কোল থেকে মাছের সংখ্যা কমে যাওয়াতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। সঙ্কটের মুখে পড়ছে নদীর সম্পদও। তাই নদীর সম্পদ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে আমার এই প্রচেষ্টা।"

রবিবার তার কাছে একটি বিশেষ দিন হলেও, আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতোই শুরু হয় তার অন্যান্য দিনগুলি। প্রত্যহ সকালে তিনি বাড়ির গরু ও পায়রাদের তাল মিছরি ও শস্যদানা খেতে দিয়ে শুরু করেন সংসারের যাবতীয় কাজ। পশুপ্রেমী হিসাবে পরিচিত সত্যেন্দ্রনাথবাবু, ঘোর বিরোধী পশুবলির। তাই যে সমস্ত মন্দিরে পশুবলির মতো প্রথা আজও অব্যাহত, সেখানে পা রাখেন না তিনি। পশুদের উন্নতিসাধনে তিনি যুক্ত আছেন, বহু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথেও। বৈজ্ঞানিক কারণবশতই নয়, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েও নিজের মৎস্য কার্যক্রমের পূর্ণ সমর্থন করেন তিনি। তিনি জানান 'হিন্দুধর্মশাস্ত্রে চোখ বোলালে এমন বহু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যাবে যেখানে মাছকে একজন ধার্মিক প্রাণী হিসেবে দেখা যায়। এছাড়া ভগবান বিষ্ণুও তার প্রথম জন্মে মৎস্যরূপ ধারণ করেছিলেন।'

গত ৩০ বছর ধরে সত্যেন্দ্রনাথবাবুকে এই মৎস্য রক্ষার কাজে অতিক্রম করতে হয়েছে বহু বাধা বিপত্তি। চক্ষুশূল হতে হয়েছে অসংখ্য মানুষের। কিন্তু কোনও বাধাই টলাতে পারেনি ৬৯ বছরের বৃদ্ধ টিকে। তাই আজ তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন বর্তমান প্রজন্মের বহু তরুণ তরুণী। খুশবু যুথানী এমনই একজন। ১৯ বছরের এই তরুণীটি প্রায় ছোটবেলা থেকেই এই কাজে সঙ্গ দেয় শ্রী বড়ালকে।

২০০৫ সালে সত্যেন্দ্রনাথবাবুর কপালে জোটে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৌলতে 'মীন মিত্র'-র সম্মান। কলিকাতায় তিনিই প্রথম ব্যক্তি যাকে এই সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে। এমনকী, মৎস্যদপ্তরের তরফে তাকে মাছ সরবরাহের ব্যাপারেও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বাজার থেকে মাছ কিনে খেতে পারেন অনেকেই, কিন্তু কেনা মাছকে নদীতে ছেড়ে নিজের ভিন্ন চিন্তাধারার পরিচয় বহন করতে পারেন সত্যেন্দ্রনাথবাবুর মতো ব্যতিক্রম মানুষেরাই। তাইতো বর্তমান যুগে এরা সকলের থেকে আলাদা, একটু 'অন্যরকম'।

উন্নয়নের নামে কৃষিকেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থাকে ধবংসের চেষ্টা চলছে

চাই স্বনির্ভর স্বাবলম্বী গ্রাম ও জৈবিক কৃষি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ শতকরা সত্তর জন ভারতবাসীই গ্রামেই বসবাস করেন। সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে গ্রামপ্রধান বলা হয়। আবার গ্রামীণ ভারতবাসীরা কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বৈশ্বিকরণ এবং উদারীকরণ-এর ফলে গ্রামীণ ভারতবাসীরা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছে। গ্রামের

অর্থনীতি প্রভাবিত হয়েছে, দুর্দশায় পড়েছে গ্রামের কৃষির উপর জীবিকা নির্বাহকারী মানুষজন। গ্রামীণ ভারতবাসীরা শহরমুখী হচ্ছে ব্যাপক সংখ্যায়। ভারতে গ্রামের সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষেরও বেশি।

উন্নয়নের নামে গ্রামীণ সভ্যতাকে গ্রামের কৃষিকেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থাকে ধবংস করার এক চক্রান্ত চলছে। 'স্পেশাল ইকনমিক জোন'

তৈরি, উর্বর তিনফসলী জমিতে টাটার 'একলাখি-কার'-এর কারখানা তৈরির ফলাফল নন্দীগ্রামে, সিঙ্গুরে ভারতবাসী প্রত্যক্ষ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের বাম-গণতান্ত্রিক ও শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী মানুষের প্রতিনিধি বলে জাহির করা বামপন্থীরা ওই অপকর্মটি করেছেন। সেই একই ঘটনা দেখা গেছে তথাকথিত দক্ষিণপন্থী বলে খ্যাত বিজু-জনতা দল ও কংগ্রেস শাসিত ওড়িশা, কংগ্রেস-বিজেপি-ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার শাসনাধীন ঝাড়খণ্ড এবং বিজেপি শাসিত ছত্তিশগড়েও। পুলিশী অত্যাচারের বিরোধিতায় গুলি চলেছে অন্ধ্রপ্রদেশের খাম্মামে। খাম্মামে বিরোধিতা করেছিল সিপিএম। গুলি চালিয়ে কৃষক হত্যা করেছিল কংগ্রেস শাসিত অন্ধ্রপ্রদেশের পুলিশ। নন্দীগ্রামে, সিঙ্গুরে বিরোধিতা করেছিল বামবিরোধী তৃণমূল, আর নিরীহ নিরস্ত্র কৃষকদের উপর গুলি চালিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ এবং বুদ্ধবাবুর চটিপরা পুলিশী পোষাক পরিহিত ক্যাডারবাহিনী। হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও নন্দীগ্রামের ধর্ষিতারা এখনও ক্ষতিপূরণ পাননি। এভাবেই গ্রামকে গ্রাম খালি করে শিল্পপতিদের মুনাফা কামানোর ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে। দৈনিক কুড়ি টাকা মাত্র ব্যয় করার ক্ষমতা যাদের আছে তাদের নিয়ে কোনও রাজনৈতিক দল বা নেতার চিন্তা-ভাবনাই নেই। তাদের কাছে সাধারণ মানুষ ভোটব্যাঙ্ক মাত্র।

রাজনৈতিক দল এবং সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার কারণে 'সেজ' ছত্রভ্রদ্বগ্ন বা বিশেষ আর্থিক অঞ্চল গঠন এবং অর্থব্যবস্থার উদারীকরণের মাধ্যমে দেশের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিভাজনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিভ্রম তৈরি হচ্ছে। একদিকে সবুজ বিপ্লব আর অন্যদিকে আরও আরও বেশি উৎপাদনের জন্য কৃষিকে যান্ত্রিক করে তোলা হচ্ছে। বাড়ছে ব্যাপকহারে কৃষিজমিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার। ফলে জমির উর্বরাশক্তি দিন দিন কমছে। 'সেজ'-এর জন্য উর্বর কৃষিজমিকে নষ্ট করে ফেলা চলছে। গ্রামকে শহরে পরিণত করার প্রয়াস নিরন্তর চলছে। অনেক ক্ষেত্রে হয়ে গেছে। যার ফলে শহরে বস্তিবাসীর সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে অপরাধ, সামাজিক দুর্নীতি এবং বাড়ছে দেহব্যবসা।

জৈবিক সার ব্যবহারে মাটিতে যে সকল কীটানু জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করত তাদের কোনও ক্ষতি হোত না। কিন্তু বর্তমানে অত্যধিক পরিমাণে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে ওই সব কেঁচো-কৃমি মারা যাচ্ছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে চারাগাছের আবশ্যক কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, জিঙ্ক, লোহা, সালফার, ম্যাগনেসিয়াম, কপার, ম্যাঙ্গানিজ, ক্লোরাইড প্রভৃতি পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে চারা সতেজ, সজীব ও পরিপুষ্ট হচ্ছে না। ফসলের উৎপাদন কমছে।

জৈবিক কৃষি ঃ

জৈবিক কৃষিতে জীবাংশের ধবংসাবশেষের উপযোগিতা রয়েছে। জীবাশ্ম থেকে সার তৈরি হয়। ওই সারকে জৈবিক সার এবং তা দিয়ে চাষ করলে তাকে 'জৈবিক কৃষি' বলা হয়। ভারতের মতো দেশে নিরামিশাষীদের সংখ্যাধিক্য। এজন্য জৈবিক কৃষি এবং গোপালন কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে অত্যন্ত উপকারী, সুসমঞ্জস এবং লাভদায়ক। গো-পালনকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে নেওয়া যেতেই পারে। এদেশে কৃষককে সমাজবন্ধু, অন্নদাতা এবং গো-প্রতিপালককে নন্দলাল-নন্দগোপাল বলে সম্মানের সঙ্গে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়ে থাকে। প্রাচীনকালে পৃষ্ঠপোষণ করার জন্য রাজাকে গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক উপাধিতে ভূষিত করা হোত। নামের আগে ওই উপাধি রাজারা সম্মানের সঙ্গে ধারণ ও গ্রহণ করতেন। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের ইতিহাস মাত্র দু'হাজার বছরের। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস লক্ষাধিক বছরের। সেই ইতিহাস কৃষি এবং সংস্কৃতি-কেন্দ্রিক।

কৃষি ও কৃষকের বিষয়ে বেদেও উল্লেখ রয়েছে বলে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু তথাকথিত আর্থিক উন্নতির খাতিরে অধিক উৎপাদন ও সবুজ বিপ্লবের কথা বলা হয়। এজন্য রাসায়নিক সার ও কীটনাশক বা বিষ প্রয়োগ করা হচ্ছে। ফলে জমির স্বাভাবিক উর্বরতা হ্রাস ও ফসল-বিনষ্টকারী পোকামাকড়ের বিনাশকারী কীটপতঙ্গ মারা যাচ্ছে। কৃষিক্ষেত্র প্রদূষিত হয়ে পরিবেশ দূষণের মাত্রা বাড়ছে। পারম্পরিক কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়ার ফসল-চক্র অনুসরণ করলে বেশিরভাগ কৃষিনির্ভর ভারতবাসীর আর্থিক লাভ হবে, স্বাবলম্বন ও কুটীর শিল্পের উন্নতি হবে। এর ফলে গান্ধীজীর স্বপ্নের 'রামরাজ্য', আচার্য বিনোবা ভাবের 'বিশ্বগ্রাম' কল্পনা এবং পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের 'একাত্মমানব দর্শন'-

অর্থ-সাশ্রয়কারী ও অধিক উৎপাদনে অপরিহার্য জৈবিক সার।

এর বাস্তবায়ন সম্ভব।

জৈবিক কৃষির বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) খরচ কম এবং উপকরণ সহজলভ্য। জৈবিক সার নিজের জায়গায় সহজে তৈরি করা যায়। ফলে রাসায়নিক সারের মতো বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয় না। অর্থ সাশ্রয়কারী।

(২) উৎপাদন ও পুষ্টি ঃ জৈবিক সার প্রয়োগে উৎপাদিত ফসলে পুষ্টিগুণ বেশি, গুণমান ভালো এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া-রহিত। রাসায়নিক সার প্রয়োগে ঠিক বিপরীত। চিকিৎসকরাও জৈবিক সারে উৎপন্ন ভোজ্য পদার্থ গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

(৩) রপ্তানী ও রোজগার ঃ বিশ্বের বাজারে জৈবিক কৃষিতে উৎপাদিত সামগ্রীর কদর এবং চাহিদা রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়— জাপানীরা কোনও রাসায়নিক সারে উৎপাদিত ভোজ্যপণ্য গ্রহণ করে না। রপ্তানী করতে পারলেই বিদেশী মুদ্রা আয় হতে পারে। গ্রাম থেকে শহরে পলায়ন রোধ করা যেতে পারে। আয় এবং স্বাস্থ্য-সুরক্ষা-দুটোই সম্ভব। গ্রামীণ জনতার গ্রামের প্রতি নিষ্ঠা জাগ্রত হতে পারে। বেশির ভাগ মানুষ মনে এই ইচ্ছা পোষণ করে যে, ঘরোয়া নিজের ক্ষেত্রে উৎপন্ন অন্ন-সবজি গ্রহণ করার। গ্রামে ধান, গম, মকাই, সর্ষে, সবজি ও ফল উৎপন্ন হবে এবং তা সকলের উপকারে লাগবে। গ্রামীণ গরীব কৃষক লাভের মুখ দেখবে। পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

(৪) রাসায়নিক সার থেকে তুলনামূলক লাভ। জৈবিক সার ব্যবহারের ফলে জমির পক্ষে প্রাকৃতিক পোষণ বা উর্বরাশক্তির বৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই ঘটে থাকে। রাসায়নিক বা কম্পোস্ট সার ব্যবহারে উর্বরাশক্তি হ্রাস পায়। উর্বরাশক্তির সহায়ক নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম এবং ১৬টি আবশ্যক পদার্থ জৈবিক সার ব্যবহারে পাওয়া যায়। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি হয়। সার কম লাগে, বারবার সেচ দেওয়ার দরকার পড়ে না। রাসায়নিক সার ব্যবহারেও নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম প্রভৃতি পাওয়া যায়, কিন্তু জমির উর্বরাশক্তি হ্রাস পায়। জমি ক্রমশ বন্ধ্যা হয়। আর্থিক লোকসান হয়। রাসায়নিক সার ব্যবহারে যে ফসল উৎপন্ন হয় তার স্বাদও স্বাভাবিক থাকে না। ওই ফসল সত্বর খারাপ হয়ে যায়। বৃহৎ শিল্পপতিরা ওই উৎপাদনে যুক্ত থাকেন, ফলে দামও বেড়ে যায়। সেক্ষেত্রে কেঁচো সার তৈরি করে জমিতে দেওয়া লাভদায়ক এক অর্থ সাশ্রয়কারী। নিজেরাই পরিত্যক্ত বস্তু দিয়ে বায়োডাঙ্গ তৈরি করা যায়। পদ্ধতিও সরল। সব মিলিয়ে জৈবিক কৃষি গ্রামীণ স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে পৌঁছানোর এক উপযুক্ত মাধ্যম।

রাজ্যবাসী সাপের তাড়া খেয়ে বাঘের গুহায় ঢুকছেন

দেবব্রত চৌধুরী

বামফ্রন্ট সরকারের ৩৩ বৎসরের অপশাসনের বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্বেষ এতখানি তীব্র হয়ে উঠেছে যে মানুষ চোখ বুজে প্রতিক্ষেত্রেই বামফ্রন্টকে নাকচ করছে। এই মনোভাবের ফলেই পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে শুরু করে বিধানসভা উপনির্বাচন ও লোকসভা নির্বাচন ছুঁয়ে পুরসভা নির্বাচন পর্যন্ত মমতা বন্দোপাধ্যায়ের বিজয়রথ বিনা বাধায় এগিয়ে চলছে। মা-মাটি মানুষের-আওয়াজ তোলা দলটির মতাদর্শ-রাজনীতি তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষায় তাদের অবস্থান ও ভূমিকা কি তা এই মুহূর্তে মানুষের বিচারের মধ্যেই থাকছে না। পশ্চিমবঙ্গবাসী মানুষের কাছে এখন একটি এজেণ্ডা— যেনতেন প্রকারেণ বামফ্রন্ট সরকার, বিশেষ করে সিপিআই(এম) দলের শাসন থেকে রেহাই পাওয়া। এই রকম অবস্থা দেখা গিয়েছিল আশির দশকের শেষে পোলাণ্ডে ও অন্যান্য পূর্ব-ইউরোপীয় দেশগুলোতে। বামপন্থীদের চরম জনবিরোধী ও দুর্নীতিমূলক আচরণ দেশের মানুষকে বাধ্য করেছিল তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিতে এবং দক্ষিণপন্থী বিকল্পকে ক্ষমতায় ডেকে আনতে।

তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমান উত্থানের পিছনে মূল রহস্যটা এখানেই। সি পি আই (এম) তথা বামফ্রন্টের রাজনীতির চরম দেউলিয়াপনার দরুণ রাজ্যের বাম রাজনীতিতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে সেই সুযোগেই মুখোশের আড়ালে কংগ্রেসী ঘরাণায় বেড়ে উঠা দক্ষিণপন্থী তৃণমূল কংগ্রেস তাকে আত্মসাৎ করে পশ্চিমবঙ্গের গদী দখলের দিকে এগোচ্ছে। পুরানো কংগ্রেসের সাথে তৃণমূল কংগ্রেসের ফারাকটা এখানেই। নিজের আদি কংগ্রেসী চেহারাটাকে আমজনতার কাছ থেকে সফলভাবে আড়াল করে রাখতে পারা এবং তার পাশাপাশি ধাপে ধাপে একটা সংগ্রামী ও আধা বাম ভাবমূর্তিও গড়ে তোলা। মমতার 'মা-মাটি-মানুষে'র স্লোগানের মধ্যে সেই রাজনৈতিক কৌশলেরই বহিঃপ্রকাশ। রাজ্যের মানুষ আপাতত তাদের এই বহুরূপী সাজেই মধ্যে রয়েছে এবং আগামী বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত যে এই প্রবণতা বহাল থাকবে তা এক রকম প্রায় নিশ্চিত। মানুষ ভুলে গেছে এই মুহূর্তে সে একদিন সোমেন মিত্তিরের উপর গোঁসা করে আলিপুর কোর্টের সামনে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে গিয়েছিলেন, এই মহিলাই ১৯৯৮ সালে দলের থেকে বেরিয়ে এসে দলের নীতি না পাল্টি য়ে শুধু দলের নামের আগে একটি ''তৃণমূল'' শব্দ লাগিয়ে কংগ্রেসীয় গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন, সৌমেন-সুব্রতদের 'তরমুজ'—সি পি আই(এম)-এর দালাল বলে গালিগালাজ করেছিলেন, আবার পরবর্তীকালে তাদেরই মা-মাটি-মানুষের দলে নিয়ে টিকিট দিয়ে সাংসদ বা মেয়র বানিয়ে দিলেন। জনগণ এখন এসব কথা মনে রাখতে চাইছে না। বলছে আগামীদিনে 'মমতাই ক্ষমতা'— এখানেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেরামতি।

সি পি আই (এম) তথা বামফ্রন্টের রাজনীতির চরম দেউলিয়াপনার দরুণ রাজ্যের বাম রাজনীতিতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে সেই সুযোগেই মুখোশের আড়ালে কংগ্রেসী ঘরাণায় বেড়ে উঠা দক্ষিণপন্থী তৃণমূল কংগ্রেস তাকে আত্মসাৎ করে পশ্চিমবঙ্গের গদী দখলের দিকে এগোচ্ছে। পুরানো কংগ্রেসের সাথে তৃণমূল কংগ্রেসের ফারাকটা এখানেই। নিজের আদি কংগ্রেসী চেহারাটাকে আমজনতার কাছ থেকে সফলভাবে আড়াল করে রাখতে পারা এবং তার পাশাপাশি ধাপে ধাপে একটা সংগ্রামী ও আধা বাম ভাবমূর্তিও গড়ে তোলা। মমতার 'মা-মাটি-মানুষে'র স্লোগানের মধ্যে সেই রাজনৈতিক কৌশলেরই বহিঃপ্রকাশ।

কিন্তু কেন্দ্রে ইউ পি এ সরকারের শরিক হওয়ার পর থেকে মাঝে মাঝেই তৃণমূল কংগ্রেসের এই বহুরূপী মোড়কটা খসে পড়ছে— আর আসল কংগ্রেসী চেহারাটা প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের উত্থান, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের পিছনে মূল ইচ্ছাটা ছিল শিল্পের জন্য কৃষকদের কাছ থেকে জোর করে কৃষিজমি অধিগ্রহণ ও কৃষকদের উপর দমন পীড়ন করা। কিন্তু সেই একই ইস্যুতে যখন জগতসিংপুরের কৃষক ও আদিবাসী জনগণ পস্কোর ইস্পাত কারখানা গড়ার বিরোধিতা করে গণতান্ত্রিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং ইউপিএ সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে উড়িশা যখন কৃষক আদিবাসীদের বাড়ী-ঘরদোর জ্বালিয়ে দেয় তখন 'কৃষকদরদী' মা-মাটি-মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিন্দুমাত্র অশ্রু বিসর্জন করতে দেখা যায় না। পরিষ্কারভাবে বলা যায় মাটির প্রতি তার দরদটা পুরোপুরি মেকী।

অন্য এক ঘটনায় আসা যাক। ইউপিএ সরকার কর্তৃক সম্প্রতি পেট্রোপণ্যের দাম বাড়ানোর প্রসঙ্গটায়। মন্ত্রিসভার যে বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় লোক দেখানোর জন্য রেলমন্ত্রী মমতা সেই সভায় উপস্থিত থাকলেন না। মন্ত্রীসভার সদস্য হলে তার সমস্ত সিদ্ধান্তের নৈতিক দায়িত্ব প্রত্যেক মন্ত্রীকেই নিতে হয় তা তিনি সংশ্লিষ্ট বৈঠকে উপস্থিত থাকুন বা না থাকুন, এক্ষেত্রে জনবিরোধী সিদ্ধান্তের পুরো দায় মমতার উপর বর্তায়।

তৃতীয় বিষয়টি হলো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোর বিলগ্নীকরণ নির্বাচনের আগে বলেছিলেন সরকারী শিল্পে বিলগ্নীকরণ তিনি বরদাস্ত করবেন না।

সম্প্রতি ইউপিএ সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা-কোল ইন্ডিয়া ও ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্ডিয়ার ১০ শতাংশ করে শেয়ার বাজারে বেচার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মন্ত্রীসভার যে বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেখানেও মমতাদি অনুপস্থিত। এই বৈঠকে এ বছরে ৪০০০০ কোটি টাকার বিলগ্নীকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইউপিএ সরকার।

সবশেষে আসা যাক তৃণমূল কংগ্রেসের 'মা' শ্লোগানটির প্রসঙ্গে। বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কোন কারণ নেই যে 'মা' মানে এখানে দেশ এবং দেশের সার্বভৌমত্ব ও সার্বিক শ্রীবৃদ্ধি। ভারত-মার্কিন পারমাণবিক চুক্তি সই করে ও তার সূত্র ধরে পারমাণবিক দায়বদ্ধতা বিল সংসদে মনমোহন সিং সরকার যখন খোলখুলি দেশের সার্বভৌমত্বকে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পায়ে সমর্পণ করতে উদ্যোগী হয়েছে তখন মমতার মুখে মা'র প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় না। দেশের স্বার্থে ইরান থেকে সস্তায় গ্যাস সরবরাহের সুযোগকে হেলায় নষ্ট করে মার্কিন অঙ্গুলি হেলনে মনমোহন সরকার যখন রাষ্ট্রপুঞ্জে ইরান বিরোধী ফতেয়ার শরিক হয় তখন তৃণমূলের 'মা' ডাক নীরব হয়ে থাকে। মমতা ও তার তৃণমূল কংগ্রেস এখন ক্ষমতার মাদকে এবং ২০১১ সালে বিধানসভা দখলের খোয়াবে মশগুল হয়ে রয়েছে। সিপিআই(এম) ও বামফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা তাদের অনুকূল রাজনৈতিক জমি তৈরি করে দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু যতদিন যাবে তাদের মা-মাটি-মানুষ স্লোগানের অন্তঃসারশূন্যতা ও তাদের আসল স্বরূপ ততই রাজ্যের মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। এটা নিশ্চিত সিপিআই(এম)-এর হাত ধরে বামফ্রন্ট আর পশ্চিমবঙ্গে শাসনে আসবে না। তাই সুবর্ণ সুযোগ অপেক্ষা করছে কোনও জাতীয়তাবাদী দলের জন্য। যদি সেই দল এখন থেকে প্রস্তুতি না নেয় তা হলে বলতে হবে পশ্চিমবঙ্গবাসী সাপের তাড়া খেয়ে বাঘের গুহায় ঢুকে পড়েছে।

মক্কা মসজিদে বিস্ফোরণে হুজি জড়িত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০০৭-এ মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণের ঘটনায় সিবিআই অর্থাৎ কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো হিন্দুত্ববাদী নেতাদের জড়িয়ে থাকার কথা অনেকদিন ধরেই বলে আসছে। যদিও স্বপক্ষে তথ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারেনি তারা। এবার আমেরিকার ন্যাশন্যাল কাউন্টার টেররিজম্ এজেন্সি (এন সি টি সি) সিবিআই-এর ঠিক উল্টো কথা বলে দিয়েছে। আমেরিকার এন সি টি সি জানিয়েছে পাকিস্তানের মদতেই হুজি (হরকতউল জেহাদ-ই-ইসলামি) ওই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। আমেরিকান সিনেটের দেশের নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটিকে এন সি টি সি-র নির্দেশক মিথাইল লেটার তাঁর 'স্টেটমেন্ট ফর রেকর্ড'-এ ওই কথাই জানিয়ে দিয়েছেন গত ২২ সেপ্টেম্বর। সিবিআই তদন্ত হাতে নিলেও হায়দরাবাদ পুলিশও বিস্ফোরণের ষড়যন্ত্রে হুজির জড়িত থাকার সম্ভাবনার কথাই ব্যক্ত করেছে।

ওই একই সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী আরও অনেক বিস্ফোরণের ঘটনা এবং অনেক মানুষের মৃত্যুর জন্যও দায়ী বলে শ্রী লেটার জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, হুজি গোষ্ঠী আবার আল কায়েদা'র সঙ্গে সংযুক্ত। আল কায়েদাই হুজি জঙ্গিদের যাবতীয় প্রশিক্ষণ দেয়। ২০০৯-এ আমেরিকার এক বিচারক (ফেডারেল গ্র্যাণ্ড জুরি) হুজি কমাণ্ডার মহম্মদ ইলিয়াস কাশ্মীরীকে ডেনমার্কের একটি সংবাদপত্রের দপ্তরে বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করার জন্য দোষী বলে ইঙ্গিত করেছিলেন।

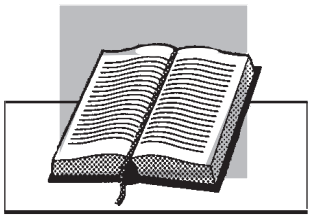

পুস্তক প্রসঙ্গ

বৈদিক ভারতবর্ষের বৈভব উঠে এসেছে সহজ সরল ভাষায়

।। ভিক্ষুদেব ভট্ট ।।

ক্ষীরোদক, ক্ষীরোদ, ক্ষীরাব্ধি, ক্ষীরসমুদ্র। অঞ্জলি ভরে যেখান থেকেই গ্রহণ করা যাক না সর্বত্রই ক্ষীর। আড়া থেকেও ক্ষীর, মাঝেও ক্ষীর। আর সর্বত্রই ক্ষীরসাগরের অধিপতি শ্রীনারায়ণের অনুভূতি। বেদ-বেদান্ত, গীতা-উপনিষদ, দর্শন-পুরাণ থেকে চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবতের পথ ধরে বন্ধুসুন্দরের হাত ধরে আধুনিক কালের রচয়িতাদের সাহিত্য মন্থন করে সর্বত্রই বৈদিক ভারতের বৈভব এমন সরল ভাষায় তুলে ধরার জন্যই যেন মনে হয় শতাধিক বৎসর পূর্বে (১৯০৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর) জন্মেছিলেন ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী। তাঁর ৯৫ বছর বয়সের মধ্যে লেখা অসংখ্য ছোট, বড়, মাঝারি রচনা তার বিপুলাকার (প্রায় ৬৫০ পৃষ্ঠা) গ্রন্থে স্থান করতে গিয়ে সংকলক বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারীজীর বিষয়সূচীর ক্রম সন্নিবেশে শিরোনামগুলি পাঠ করলেই বোঝা যায় কী সুবিস্তৃত পটে আচার্য মহানামব্রত তাঁর লেখনী চালনা করেছিলেন ঃ বেদ-বেদান্ত ও দর্শন, তন্ত্র ও মাতৃসাধনা, রামায়ণ ও মহাভারত, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু, পরিকর ও বন্ধুবাণী ব্যাখ্যা, বিবিধ, মহাজীবন স্মরণে।

ব্রহ্মচারীজীর প্রতিটি লেখায় ক্ষীরসাগরের ননীচোরার স্বাদ। ভগবদ্ কথা, কৃষ্ণচিন্তার সাথে সনাতন ধর্ম, হিন্দুধর্ম, ভারতসংস্কৃতির সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে। নিজে গৌড়ীয় বৈষ্ণব পন্থের বিশেষ ধারার অনুগামী অথচ সম্প্রদায়গত গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে উঠে শ্রীভগবানের শ্রীচরণে এমন প্রাণঢালা ভালবাসায় আত্মসমর্পিত যে তাঁর মতবাদ যেন আলাদা এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ধরে পরম্পরাগত ভারতকথা বলে চলেছেন— সব নদীই এসে মিশেছে সাগরে —রসসাগর, হরিকথাপুষ্ট রস। সেটি কেমন ধারা? তাঁর লেখনীতেই বলি।

‘জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সকল ভারতীয় ধর্ম সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক ভাবনার মূল উৎস শ্রুতি। এই দেশে ইহা এক আশ্চর্য ঘটনা যে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এত মতবিরোধ, কিন্তু সকলের সর্বাশ্রয় উপনিষৎ। ইহার কারণ মনে হয় যে, শ্রুতিতে যে একটি বিরাট সমন্বয়ের সংবাদ আছে তাহা আমরা জনগণ শুনিতে পাই নাই। শুনিয়াছিলেন যে আচার্যগণ তাঁহারা সকলে বিভেদের ঊর্ধ্বে উঠিয়াছিলেন।

ভারতের দুর্দিন। সে ক্রমে শ্রুতিদৃষ্টি হইতে দূরে সরিতেছে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে দুর্ভাগ্য, তাহারা শ্রুতিরূপ মহাসমন্বয় সূর্যের দিকে চক্ষু ফিরাইতেছে না। ‘পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার’ সেই দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ। তবু জানি না কেন ভাবি— অমৃতময়ী শ্রুতি মরিবে না, ঋষি-সঙ্ঘের আধ্যাত্মিক আলবেলার জল শুকাইবে না, ভারতে ভারতীয় সাত্ত্বিক সিংহাসন টলিবে না’।... (‘শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী (১ম খণ্ড)’-এর প্রথম অধ্যায় বেদ-বেদান্ত ও দর্শন শীর্ষকের প্রথম নিবন্ধ ‘অপৌরুষেয় গ্রন্থ বেদ’)

বৈষ্ণব কুলচূড়ামণি মহানামব্রত বাংলাদেশে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আনন্দময়ী

কালীবাড়ীর ‘দ্বারোদঘাটন’ (এই শীর্ষকে লেখা পৃ.-৬০, অধ্যায় ঃ তন্ত্র ও মাতৃসাধনা) উৎসবে জানাচ্ছেন, ‘হিন্দুধর্মের কোনও প্রচারক নাই। আমাদের ভাল প্রচারক থাকিলে আমাদের এই অধঃপতন হয়তো কিছুটা ঠেকানো যাইত। কয়েক বছর যাবৎ হিন্দুধর্মের দুইটি বড় প্রচারক সংস্থা পাওয়া গিয়াছে ইহা আমাদের আনন্দের বিষয়। তাঁদের মধ্যে প্রথমে নাম করিতে হয় ‘ইসকন’-এর।...ইঁহারা পরম বৈষ্ণব হইয়াছেন, কিন্তু হিন্দু হন নাই। বৈষ্ণব ধর্ম হিন্দুধর্মের একটি শাখা। হিন্দুধর্ম একটি বিরাট মহীরূহ। ইহার শাখাপ্রশাখা অগণিত। মূলের সহিত যুক্ত না থাকিয়া ডালে ডালে বেড়াইলে তার পতন সম্ভাবনা সর্বদাই। শাখা-প্রশাখা নিয়া যতই আলোচনা করি তাহার মূল না জানিলে হয় অঙ্গহানি, দোষদুষ্ট। মাথাহীনের দেহের পরিণাম পতন ছাড়া আর কী?

কোনও দেশে বা মন্দিরে গিয়া ইসকন্-ভক্ত কালীমূর্তি দেখিতে পাইয়া চক্ষু ঘুরিয়া পলায়ন করে। মা কালীকে দেখিলে যাঁহাদের নাসিকা কুঞ্চন করিতে হয় সে কিছুতেই হিন্দু হইতে পারে না। তাঁর প্রচারে হিন্দুধর্মের প্রসার হইতে পারে না। সুতরাং ইসকনের প্রচারে হিন্দুধর্মের অপপ্রচার হইতেছে... আমরা ইসকনের কাছে প্রার্থনা করি, আপনারা প্রথমে হিন্দু হউন, তারপর বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারে দেশকে জয়যুক্ত করুন। কালী দেখিলে পালাইবেন না।

দ্বিতীয়তঃ রামকৃষ্ণ মিশনের কথা বলিব। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচার এখন তুঙ্গে। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ বাল্যবেলা হইতে।... এই মিশনই হিন্দুধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচারক। বর্তমানে মনে হয় বাংলার অধিকাংশ লোক ঠাকুরের ভক্ত।

কয়েক বৎসর যাবৎ অতি দুঃখের সহিত ইঁহাদের মধ্যে এক অভিনব ব্যাপারে লক্ষ্য

(এরপর ১৩ পাতায়)

বইপাড়ার খবরাখবর

শিল্প, সংস্কৃতি থেকে চাকদহের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে, চাকদহ ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি। বইটির দাম ২৫০ টাকা এবং প্রকাশক নবপত্র প্রকাশন। ‘লোকসংস্কৃতি গবেষণা’ পত্রিকার এবারের বিষয় ‘মঙ্গলকাব্যে লৌকিক উপাদান।’ দাম ৬০ টাকা। পত্রিকাটি পাওয়া যাবে পাতিরাম বুকস্টল থেকে। শিবশংকর ঘোষ রচিত ‘বঙ্গের শারদোৎসব ও ব্যতিত্র(মী দুর্গাপূজা’ প্রকাশিত হয়েছে প্রভা প্রকাশনী থেকে। বইটির দাম ৩৫০ টাকা। রবীন্দ্র প্রস্তাবে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সূচনা। দেশ বিদেশের নানা সাহিত্য সম্মেলনে রবীন্দ্রপ্রদত্ত ভাষণ সমগ্র নিয়ে ডঃ অমরনাথ করণ সম্পাদিত, ‘সাহিত্য সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ’ বইটির দাম ১৫০ টাকা এবং বইটির প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। স্বামী সহদেবানন্দ রচিত ‘শ্রীরামকৃষ(ভাবালোকে নর্মদা প্রদ(ণ’ বইটি প্রকাশিত হয়েছে মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থেকে। বইটির দাম ১০০ টাকা। প্রেস ক্লাব, কলকাতার সূচনা ২২ জুলাই ১৯৪৫ সালের পর থেকে বার্ষিক সংখ্যায় প্রকাশিত নির্বাচিত কিছু লেখা নিয়ে ‘নির্বাচিত সংকলন’। বইটির প্রকাশদীপ প্রকাশন। দাম ২০০ টাকা। বিজলি সরকার সম্পাদিত ‘রবীন্দ্রনাথের বঙ্কিমচন্দ্র ঃ বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ।’’ প্রকাশক বঙ্কিম ভবন গবেষণা কেন্দ্র। নৈহাটি। দাম ৩৫০ টাকা।

নঃ ভঃ

রোগ নিরাময়ে গাছ-গাছড়ার ভূমিকা

।। **সাধনানন্দ মিশ্র** ।।

প্রকৃতিদেবীর সন্তান মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা, বৃক্ষলতা গুল্ম, নদ-নদী, পাহাড় পর্বত প্রভৃতি নিয়ে বিশাল জীবজগৎ। প্রকৃতির সঙ্গে এদের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, কিন্তু যেদিন থেকে মানুষ প্রকৃতিমাতাকে ভুলে গিয়ে তাকে শোধন করে নগরকেন্দ্রিক কৃত্রিম সভ্যতার পত্তন শুরু করলো, সেদিন থেকেই মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে শুরু করেছে। ভোগবাদী সভ্যতা প্রবেশের ফলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হতে বসেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার কুপ্রভাব পড়ে মনুষ্যজীবনকে করেছে নানারূপ নূতন নূতন রোগের শিকার। অথচ এই ভারতবর্ষেরই প্রাচীন মুনি-ঋষিগণ এবং গ্রামে ও জঙ্গলে থাকা অধিবাসীবৃন্দ তাঁদের রোগের প্রতিকার করতে ও নীরোগ স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করতে দেশীয় সাধারণ গাছ-গাছড়া লতা গুল্মের সাহায্য নিতেন। প্রাচীন যুগের ভারতীয় চিকিৎসক সুশ্রুত-চরক-জীবক প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ ভারতীয় বৃক্ষলতাগুল্ম থেকেই বিভিন্ন রোগ দূরীকরণের জন্য ঔষধ সংগ্রহ করতেন। সেই ঔষধ প্রয়োগের ফলে তাঁরা মানুষের রোগ বিতাড়ন করে তাদের সুস্থ ও সবল রাখার ব্যবস্থা করতেন। তাঁরা কোন্ বিশেষ গাছের সাহায্যে কোন্ রোগ ভাল হবে তা জানতেন ও কোন্ গাছ কোন সময় কোথায় উৎপন্ন হয়, তা জানতেন ও গাছকে চিন্‌তেন ও নানা গাছের নানা নামকরণও করেছিলেন। রোগ প্রতিরোধক ও নিরাময়কারী অসংখ্য ভেষজ উদ্ভিদ আমাদের দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে অনাদৃত অবস্থায়, আমরা সাধারণ লোক তার সব কিছুই চিনতে পারি না। চিন্‌তে পারলে ও সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে পারলে এই গরীব দেশে অনেক কম খরচেই বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়— একথা আমরা জেনেও যেন জানি না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা এই ভারত থেকেই বিভিন্ন গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করে তার থেকে ঔষধ তৈরী করে বহুজাতিক কোম্পানীর মাধ্যমে আমাদের কাছেই বেশি দামে বিক্রি করছেন, তা জেনেও আমরা তার প্রতিকারে অক্ষম।

আলোচ্য ‘ভেষজ উদ্ভিদ ও তার গুণাগুণ’ গ্রন্থের লেখক ডঃ প্রবীররঞ্জন শূর একজন বিশিষ্ট ও প্রখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী। দীর্ঘ ৩৫ বছরেরও বেশী সময় তিনি উদ্ভিদ বিজ্ঞানের বিষয়ে গবেষণাকার্যে লিপ্ত রয়েছেন। ভারতবর্ষের উদ্ভিদ-এর বিভিন্ন প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজারেরও বেশী। কিন্তু মাত্র ৫০০০ উদ্ভিদ-এর গুণাগুণ ও প্রয়োগ, ব্যবহার সম্পর্কে পাওয়া বৈজ্ঞানিক তথ্য থেকে জানতে পারা যায় যে, এইগুলির বেশীর ভাগেরই রোগ নিরাময় ও প্রতিষেধক ক্ষমতা রয়েছে। বৈজ্ঞানিকরা কোন রোগে কোন উদ্ভিদ, রোগ নিরাময় ব্যাপারে কী কাজ দেয়, তাও তাঁরা নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। ভারতের বিভিন্ন গ্রামে ও জনতাতি অধ্যুষিত বিভিন্ন গ্রামেও জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে তাদের রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত সাধারণ গাছগাছড়া সম্পর্কে লেখক প্রত্যক্ষ জ্ঞানসঞ্চয় করেছেন। এইসব দুষ্প্রাপ্য গাছ-গাছড়া লতা গুল্মই জনজাতিদের বিভিন্ন রোগ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। লেখকের গবেষণা ও বহু পরিশ্রমে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ফলেই তিনি তাঁর আলোচ্য এই বইটিতে ১০৪টি গাছ-লতা-গুল্মের বিশেষ বিবরণ, গাছটির সংক্ষিপ্ত পরিচয়, তার প্রজাতি, তার রোগ প্রতিষেধক, নিবারক ও নিরাময়ের ক্ষমতা ও প্রয়োগ পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতি বন্ধুদের সঙ্গে মিশে তাদের জীবনযাত্রা পদ্ধতি,

বিশল্যকরণী পাতা

তাদের রোগ-আরোগ্যে জঙ্গলে পাওয়া অনাদরে বর্ধিত গাছ-গাছড়া ভেষজ হিসাবে সার্বিক প্রয়োগের বিষয়ও তাঁদের কাছ থেকে জেনেছেন। কয়েকটি উদাহরণ— অর্জুনগাছ, অপরাজিতা, অশোক, অশ্বগন্ধা, ওলটকম্বল, কচুরীপানা, কুচিলা, ধুতুরা, নয়নতারা, সেগুন, শিমুল ইত্যাদি ১০৪ রকমের ভেষজ উদ্ভিদের নাম, পরিচয় উচ্চাঙ্গ চিত্র ও তার সঙ্গে রোগ আরোগ্যের ও প্রতিরোধের জন্য এর প্রয়োগের কথাও রয়েছে।

এই গাছগুলির বেশীর ভাগ ছড়িয়ে রয়েছে ভারতের বিভিন্ন বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ী অঞ্চলে, পূর্বঘাট, পশ্চিমঘাট পর্বতমালার বিভিন্ন অঞ্চলে, হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ও সমতলভূমিতে। কেরলের একটি অঞ্চলে ত্রনপুন্দ্ধব্ধ দ্ধব্রপুপুন্দ্বন্ত(নিঃশব্দ উপত্যকা) নামে একটি জায়গা রয়েছে। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের মতে, ওই জায়গাটিতে দুষ্প্রাপ্য গাছ-পালা, তৃণ ও বিভিন্ন উদ্ভিদ এবং বহু পশুপক্ষী ইত্যাদি রয়েছে। এই অঞ্চলটির বয়স প্রায় ৫০ লক্ষ বছর হবে।

উদ্ভিদ চেনার ব্যাপারে উৎসাহী ব্যক্তিরা আলোচ্য বই থেকে অনেক উপাদান পেয়ে যাবেন, যাতে করে তাঁদের গবেষণার উৎসাহ বেড়ে যাবে। এ ব্যাপারে গবেষণায় উৎসাহদান সরকারেরও কর্তব্য।

প্রকৃতির সঙ্গে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বজায় রেখে যে প্রাচীন ভারতে চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ছত্রে ছত্রে তার প্রমাণ রয়েছে। চরক ও সুশ্রুত প্রণীত পুস্তকেও আমরা বহু রোগের নিরাময় ও প্রতিরোধের চিকিৎসার বিবরণ পেয়ে থাকি। তার মধ্যে বেশীর ভাগই উদ্ভিদ থেকে ঔষধ প্রস্তুত করা হোত এবং তার দ্বারা সফল চিকিৎসা হোত, শুধু মানুষেরই নয় পশুপক্ষীদেরও। এখন বিশ্বায়নের যুগে ভারতে উদ্ভুত প্রচুর ভেষজ উদ্ভিদ্ এখান থেকে চলে যাচ্ছে বিদেশে। সেখানকার বহুজাতিক কোম্পানীগুলি সেই সব ভেষজ উদ্ভিদ থেকে নানরকম ঔষধ তৈরি করে বিভিন্ন নামে ও বেশী দামে ভারতের জনগণের কাছে বিক্রি করছেন এ্যালোপাথিক চিকিৎসাপদ্ধতির মাধ্যমে। এইভাবে বহু প্রজাতির উদ্ভিদ ভারত থেকে লুপ্ত হতে চলেছে। এ ব্যাপারে ভারতের জনসাধারণ অবহিত হয়ে এ ব্যবসা বন্ধ করতে না পারলে এই ভেষজ উদ্ভিদ সম্পদ থেকে ভারত নিঃস্ব হয়ে যাবে। এই ব্যাপারে নূতন প্রজন্মের গবেষকরা অবহিত হয়ে ভারতের এই উদ্ভিদ সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতিসাধন করে জনগণের মঙ্গলের কাজে লাগাবেন এটাই আশা। এই আশা পূরণ করতে হলে লেখকের আলোচ্য পুস্তকটি খুবই সাহায্য করবে মনে করে গবেষকদের এটি সংগ্রহ করে রাখা একান্ত প্রয়োজন বলেই মনে হয়। বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের পক্ষে স্কুল বা কলেজ স্তরে এই বইটি পাঠ্যপুস্তকের জন্য নির্বাচিত হওয়া উচিত বলে মনে করি। এতে প্রথম থেকেই ছাত্রদের জ্ঞানভাণ্ডার বেড়ে উঠবে ও গবেষণায় উৎসাহ বাড়বে। বইটির বহুলপ্রচার কাম্য।

‘ভেষজ উদ্ভিদ ও তার গুণাগুণ ঃ লেখক- ডঃ প্রবীররঞ্জন শূর। প্রকাশক - কেষ্ট বুক্স্, ১এ কলেজ রো, কলকাতা-৯, মূল্য-১২০্ মাত্র।

মধ্যযুগে বাংলার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব রাজা গণেশ

নির্মলেন্দু চক্রবর্তী

মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে রাজা গণেশ একজন অবিস্মরণীয় পুরুষ ছিলেন। ১২০৪ খৃস্টাব্দ থেকে ১৭৬৫ খৃস্টাব্দে মুসলমান শাসনের অবসান পর্যন্ত আর কোনও হিন্দু বাংলাদেশ শাসন করার কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেননি।

"বাংলাদেশের মধ্যযুগের ইতিহাসে যাঁদের নাম ভাস্বর অক্ষরে লেখা রয়েছে, রাজা গণেশ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। একক কৃতিত্বের দিক দিয়ে গণেশের সঙ্গে খুব কম লোকেরই তুলনা চলতে পারে। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা ছিল মুসলমানদের অধিকারে। এর মধ্যে কোনও কোনও সময় অঞ্চল বিশেষে হিন্দুদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে বটে; কিন্তু সমগ্র বাংলার সিংহাসন অধিকার এই একটি মাত্র হিন্দুর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। পঞ্চ দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে গণেশ বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের মতো আবির্ভূত হয়ে অসাধ্য সাধন করেছিলেন। প্রবল বিরুদ্ধ শক্তির বাধাকে জয় করে বাংলায় হিন্দুরাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গণেশের কীর্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত নেই।" (বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, সুখময় মুখোপাধ্যায়)

রাজা গণেশ সম্পর্কে যদিও ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রচুর মতানৈক্য রয়েছে। এর কারণ সমসাময়িক কালের সার্থক ঐতিহাসিক বিবরণের অভাব। 'তবাকাৎ-ই-আকবরী', 'তারিখ-ই-ফিরিশতা' ও 'ম্যামিরি-ই-রহিসী প্রভৃতি গ্রন্থে গণেশ সম্পর্কে কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। রাজা গণেশের পূর্ব পরিচয় সম্পর্কে কোনও প্রামাণিক তথা পাওয়া যায় না। রিয়াজ-উল্-মালাতীন' অনুসারে রাজা গণেশ ভাতুড়িয়ার জমিদার ছিলেন। ভাতুড়িয়া নামটি খুব প্রাচীন। রেনেল সাহেবের মানচিত্রে উত্তরবঙ্গের এক বিরাট এলাকাকে ভাতুড়িয়া বলে দেখানো হয়েছে। ইহার পশ্চিমে মহানন্দা ও পুনর্ভবা নদী, দক্ষিণে পদ্মানদী, পূর্বে করতোয়া নদী ও উত্তরে দিনাজপুর ও ঘোড়াঘাট।

গণেশের নাম নিয়েও এক সময় ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছিল। কারণ মুসলমানদের লেখা বিভিন্ন পুঁথি পুস্তকে গণেশের নাম 'কানস' বা 'কনিস' বা 'কানসি' রূপে লেখা হয়েছে। এ বইগুলি ফার্সী ভাষায় লিখিত। গণেশ নামটা প্রথম বুকাননই ব্যবহার করেন। সম্ভবত তিনি পাণ্ডুয়ায় যে ফার্সী পাণ্ডুলিপি পেয়েছিলেন তাতে নামটি ওইভাবেই লিখিত ছিল। বর্তমানে সকল আধুনিক পণ্ডিত গণেশ নামটিই গ্রহণ করেছেন।

বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চে গণেশের অভ্যুত্থান একটি বিশেষ ঘটনা। মনে করা হয় ইলিয়াসশাহী সুলতানদের আমল থেকেই হিন্দুরা বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। মুসলমান রাজ্যে গণেশের মতো একজন হিন্দু জমিদারের এইভাবে ক্ষমতা লাভ মুসলমান সুফী-সাধকরা মোটেই পছন্দ করেন নাই। সুতরাং গিয়াস-উদ্-দীন গণেশ সহ অন্যান্য হিন্দু রাজকর্মচারীদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য উদ্যোগী হন। কিন্তু বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, আর্থিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে গণেশও কম ছিলেন না। এই সময় ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্বে সুলতান নিজেই গণেশের কাছে হেরে যান ও নিহত হন। গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ নিহত হবার পর তাঁর পুত্র সৈফুদ্দিন হামজা শাহ সিংহাসনে বসলেন বটে কিন্তু প্রকৃত শাসন ক্ষমতা গণেশের হাতে চলে যায়।

শেষপর্যন্ত রাজবংশের আর কোনও উত্তরাধিকারী না থাকায় এবার গণেশ নিজেই সিংহাসনে বসেন। গণেশ নিজে সিংহাসনে বসাতে রাজনৈতিক দলাদলিতে মগ্ন মুসলমান আমীর-অমাত্যগণ তাদের ভুল বুঝতে পারলো। কারণ তারা এতদিন দলাদলি করেছে কোনও না কোনও মুসলমান প্রার্থীর পক্ষে। কিন্তু বিধর্মী গণেশের সিংহাসন দখল করা তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। কারণ মুসলমান রাজ্যে কোনও অমুসলমানের রাজা হওয়া কোরাণ বিরোধী। কিন্তু গণেশের বিরোধিতা করার ক্ষমতাও আর তখন তাদের নেই। এমতাবস্থায় বাংলার দরবেশরা এগিয়ে আসেন। দরবেশের নেতা ছিলেন নূর কুতুব আলম। দরবেশদের বিরোধিতা গণেশ কঠোর হস্তে দমন করেন ও কয়েকজনকে প্রাণদণ্ড দেন। এতে দরবেশরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। নূর কুতুব আলম উত্তর-পূর্ব ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী নৃপতি জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে বাংলায় অভিযান করে গণেশকে উচ্ছেদের আহ্বান জানালেন। ইব্রাহিম লোদী এই পত্র পেয়ে জৌনপুরের দরবেশ আসরফ মিমনানীর উপদেশ প্রার্থনা করলেন। দরবেশ মিমনানীর অনুমোদন পেয়ে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম লোদী বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। এতে ভীত হয়ে গণেশ দরবেশ কুতুব আলমের নিকট উপস্থিত হয়ে আত্মসমর্পণ করলেন। তিনি ১২ বৎসর বয়স্ক পুত্র যদুকে দরবেশের নিকট নিয়ে আসেন এবং বলেন, 'আমি বৃদ্ধ হইয়াছি এবং সংসার ত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়াছি, আপনি আমার ছেলেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া তাহার হাতে রাজ্য ভার দিতে পারেন।" দরবেশ কুতুব আলম স্বীয় মুখ হতে কিছু চর্বিত পান নিয়ে যদুর মুখে পুরে দিলেন এবং তাকে মুসলমান ধর্মের কলমা পড়িয়ে ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত করিলেন। তাকে জালাল-উদ-দীন নাম দিয়ে এই কথা নগরে ঘোষণা করা হলো এবং রাজ্যে তাহার নামে খোৎবা পাঠের ব্যবস্থা করা হলো। সেইদিন হতে মুসলিম আইনের পবিত্র ধারাগুলি আবার চালু হলো।

আবিষ্কৃত মুদ্রা থেকে এরপর নূর কুতুব আলম নিজে ইব্রাহিম লোদীকে বাংলা আক্রমণ করতে নিষেধ করে যুক্তি দেখান যে বাংলার সিংহাসন আর বিধর্মী কাফেরদের হাতে নেই। একজন মুসলমান এখন বাংলার সিংহাসনে বসেছেন। সসৈন্যে আগত ইব্রাহিম লোদী অসন্তুষ্ট হয়ে জৌনপুর ফিরে যান। ইতিমধ্যে দরবেশ নূর কুতুব আলমও পরলোক গমন করেন। এইভাবে বিপদমুক্ত হয়ে গণেশ যদুকে পুনরায় হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করে নিজেই 'দনুজমর্দনদেব' উপাধি গ্রহণ করে বাংলার সিংহাসনে বসেন ও তাঁর নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। বঙ্গাক্ষরে 'দনুজমর্দনদেব' খোদিত মুদ্রা প্রকাশিত হয়। এই মুদ্রাগুলির একদিকে রাজার নাম ও অপরদিকে ট্যাঁকশালের নাম, মুদ্রা প্রকাশনের সাল ও "চণ্ডীচরণ পরায়ণস্য" লেখা থাকত। 'দনুজমর্দনদেব' নামে সমগ্র ১৩৩৯ শকাব্দ (১৪১৭-১৮ খৃঃ) এবং ১৩৪০ শকাব্দের (১৪১৮-১৯ খৃঃ) কিছুকাল রাজত্ব করার পর রাজা গণেশ পরলোক গমন করেন। মনে হয় তিনি ধর্মান্তরিত জালালউদ্দিনকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে এনেছিলেন এবং তাকে বন্দী করে রেখেছিলেন। জালালউদ্দিনের ষড়যন্ত্রেই রাজা গণেশের মৃত্যু হয় বলে কেউ কেউ মনে করেন।

ফিরিশতার মতে গণেশ সাত বৎসর রাজত্ব করেন। মিরাত-উল-আসরারেও এই কথা লেখা আছে। রিয়াজেও বলা হয়েছে যে গণেশের রাজত্ব এবং অত্যাচার সাত বৎসর কাল স্থায়ী হয়। কেউ কেউ মনে করেন যে গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহের মৃত্যুর পর হতে গণেশ প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতার অধিকারী হন। সুতরাং সেই তারিখ থেকে ১৩৪০ শকাব্দ বা ৮২১ হিজরী পর্যন্ত মোট সাত বৎসর হয়। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে যে বায়েজিদ শাহের মৃত্যুর পর গণেশ সিংহাসনে বসেন এবং ইব্রাহিম লোদীর আগমন পর্যন্ত তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতএব এই দফায় গণেশের রাজত্ব বেশীদিন স্থায়ী ছিল বলে মনে হয় না। সুখময় মুখোপাধ্যায় মনে করেন এই পর্বে গণেশের রাজত্ব ছয় মাস কাল স্থায়ী হয়। মুদ্রা প্রচলনের হিসাব থেকে দেখা যায় যে দ্বিতীয় দফায়ও গণেশের রাজত্ব ১৩/১৪ মাস স্থায়ী হয়।

খুব অল্প সময়ের জন্য রাজত্ব করলেও রাজা গণেশ প্রায় সমগ্র বাংলাই তাঁর অধিকারে এনেছিলেন। উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গের প্রায় সমস্তটা; মধ্য, পশ্চিম ও দক্ষিণবঙ্গের অনেকাংশ তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

"আধুনিক গবেষকদের প্রায় সকলেই গণেশের ব্যক্তিত্ব ও কূটনীতির প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি অবশ্যই প্রশংসা পাওয়ার উপযুক্ত। বাংলাদেশে পাঁচশত বৎসর ধরিয়া একটানা মুসলমান শাসনের মধ্যে তিনি ছেদ টানিয়াছিলেন এবং স্বল্প সময়ের জন্য হইলেও হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার কূটনীতি জ্ঞানের পরিচায়ক। রাজনৈতিক দলাদলিতে তিনি নিপুণ ছিলেন। তিনি এমনভাবে মুসলমান অমাত্য এবং সেনানায়কদিগকে নিজ দলে আনিয়াছিলেন যাহাতে তাহারা তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারে। তিনি কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিয়াছিলেন। অর্থাৎ মুসলমানদের দ্বারা মুসলমান রাজাকে হত্যা করিয়াছিলেন এবং এই উপায়ে শেষ পর্যন্ত ইলিয়াসশাহী রাজবংশের কেহ যখন অবশিষ্ট রহিল না, তখন তিনি স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং নিজেই সিংহাসনে বসেন। মুসলমান নেতৃবৃন্দ যখন তাহার আসল উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন, তখন তাহাদের আর কিছুই করার ছিল না।" (বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল-প্রফেসর আব্দুল করিম)

রাজা গণেশের রাজকীয় ব্যক্তিত্ব ও কুশাগ্র বুদ্ধির দ্বারাই সেই সুদূর মধ্যযুগে বিদেশী মুসলমান শাসকদের পরাভূত করে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও বাংলায় হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। এটি একটি অতি বিরল ঘটনা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুসলমান শাসনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এমন একটি নজিরও চোখে পড়বে না। এই ঘটনার প্রায় দেড়শ বছর পর একমাত্র দিল্লীর সিংহাসনে ১৫৫৬ সালে হিমু বা হেমচন্দ্র নামে একজন হিন্দুও স্বীয় প্রতিভা ও ক্ষমতা বলে মাত্র ৯ মাসের জন্য রাজকীয় ক্ষমতা হাতে পেয়েছিলেন।

বিভিন্ন সূত্রে রাজা গণেশের নামে মুসলমান নির্যাতনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এদের মধ্যে রাজা গণেশের সমসাময়িক দুজন দরবেশ আশরাফ জাহাঙ্গীর মিমনানী ও পাণ্ডুয়ার নূর কুতুব আলম তাদের চিঠিতে রাজা গণেশের মুসলমান অত্যাচারের কাহিনী প্রচার করেন।

এইসব সূত্রগুলির যথার্থতা প্রমাণের জন্য একটু আলোচনা প্রয়োজন। এ বিষয়ে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদারের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লেখেন— ৮১৭ হিজরীর (১৪১৪-১৫ খৃঃ) শেষ দিকে গণেশ আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে সিংহাসনচ্যুত (ও সম্ভবত নিহত) করেন এবং নিজের শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে মুসলমান রাজত্ব সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিয়া স্বয়ং বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সুতরাং দরবেশ নূর কুতুব আলমের গণেশের বিরুদ্ধে মুসলমানদের উপর অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী ধোপে টেঁকে না। দরবেশরা তার বিরোধিতা করায় কয়েকজন দরবেশকে গণেশ হত্যা করেছিলেনও, কয়েকজনের প্রতি অত্যাচারও করেছিলেন, এটা ঠিক। এটা মধ্যযুগের রাজনীতির একটা অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই জানেন বাংলায় মুসলমান শাসন চালু হবার পর থেকে এমন কোনও সুলতান নেই যিনি ব্যাপকহারে হিন্দুমন্দির ধ্বংস, হিন্দুদের সম্পদ লুণ্ঠন, ঘরবাড়ী ধ্বংস ও নরনারীদের ব্যাপকহারে ধর্মান্তরিত করেন নাই।

'তারীখ-৯-ফিরিশতার' একস্থানে ফিরিস্তা লেখেন যে "যদিও রাজা কান্‌স মুসলমান ছিলেন না, তা হলেও তিনি মুসলমানদের সঙ্গে এতখানি বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতার সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পরে কোনও কোনও মুসলমান তাঁকে মুসলমান বলে ঘোষণা করে ইসলামের প্রথা অনুযায়ী কবর দিয়ে রেখেছিলেন। ফিরিশতার মতে গণেশের অনেক মুসলমান বন্ধু ছিল এবং তিনি একজন দক্ষ সুশাসক ছিলেন।

"গণেশ যে একজন উচ্চস্তরের কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি যেভাবে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা প্রশংসার যোগ্য। সুতরাং রাজা গণেশের বিরুদ্ধে মুসলমানদের নির্যাতনের কাহিনী অমুলক বলেই মনে হয়।" (বাংলার ইতিহাস, সুলতানি আমল— প্রফেসর আব্দুল করিম)

গৌড় ও পাণ্ডুয়ার কয়েকটি স্থাপত্য কীর্তি রাজা গণেশেরই তৈরি বলে কেউ কেউ মনে করেন। এদের মধ্যে গৌড়ের 'ফতেখানের সমাধিভবন' এবং পাণ্ডুয়ার 'একলাখী প্রাসাদে'র নাম উল্লেখযোগ্য। কোনও কোনও ঐতিহাসিক মনে করেন যে তিনি আদিনা মসজিদের সংস্কার করে ইহাকে তাঁর কাছারী বাড়ী হিসেবে ব্যবহার করতেন। বিভিন্ন সূত্রাদি পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে ১৪১৮ খৃঃ রাজা গণেশ মৃত্যুবরণ করেন এবং তারপর তার আরেক পুত্র 'মহেন্দ্রদেব' উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন ও নিজ নামে মুদ্রা চালু করেন। কয়েক মাস মাত্র রাজত্ব করার পর বড় ভাই জালালউদ্দিন তাঁকে সরিয়ে দিয়ে সিংহাসন দখল করে নেন। জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহ ১৪১৮ থেকে ১৪৩৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত কায়েমি রাজত্ব করেন।

জালালউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আহমদ শাহ 'শামস্‌উদ্দিন-আহম্মদশাহ' উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে বসেন। মাত্র তিন বছর রাজত্ব করার পর আহম্মদ-শাহ ১৪৩৬ সালে তার ক্রীতদাসদের হাতে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গৌড়ে রাজা গণেশের বংশধরদের শাসনের অবসান হয়।

(লেখক চাকদা হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক)

বাংলার রাজনৈতিক যজ্ঞে গণেশের অভ্যুত্থান একটি বিশেষ ঘটনা। মনে করা হয় ইলিয়াসশাহী সুলতানদের আমল থেকেই হিন্দুরা বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। মুসলমান রাজ্যে গণেশের মতো একজন হিন্দু জমিদারের এইভাবে ক্ষমতা লাভ মুসলমান সুফী-সাধকরা মোটেই পছন্দ করেন নাই। সুতরাং গিয়াস-উদ্-দীন গণেশ সহ অন্যান্য হিন্দু রাজকর্মচারীদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য উদ্যোগী হন। কিন্তু বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, আর্থিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে গণেশও কম ছিলেন না। এই সময় ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্বে সুলতান নিজেই গণেশের কাছে হেরে যান ও নিহত হন। গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ নিহত হবার পর তাঁর পুত্র সৈফুদ্দিন হামজা শাহ সিংহাসনে বসলেন বটে কিন্তু প্রকৃত শাসন ক্ষমতা গণেশের হাতে চলে যায়।

চিঠিপত্র

প্রসঙ্গ 'দেগঙ্গা'

'দেগঙ্গার ঢালিপাড়ার হিন্দু মহিলাদের আশ্রয় দিয়েছেন বেনাপুরের মুসলিম মেয়েরাই' শিরোনামে সুকুমার মিত্রের প্রেমের সুললিত বাণী ছড়ানো নিবন্ধটি 'দৈনিক স্টেটসম্যান' প্রকাশ করেছে (১৭.৯.২০১০)। ভিতরের উদ্দেশ্য যাই হোক, বাহ্যতঃ এটি আক্রান্ত হিন্দু ও আক্রমণকারী মুসলমানদের মধ্যে প্রেম সৃষ্টির প্রচেষ্টা। রচনার শিরোনামেই বোঝা যায় লেখক বোঝাতে চেয়েছেন দেগঙ্গার মুসলমান জঙ্গিরা হিন্দুদের যত ক্ষতিই করুক, বেনাপুরের মুসলিম মহিলারা তো আক্রান্ত হিন্দু মহিলাদের আশ্রয় দিয়েছে। অতএব মাভৈঃ। সান্ত্বনা আছে।

মিত্র মশায় শুরুতেই কবিগুরুর উক্তি দিয়েছেন। সঙ্গত কারণেই আমরা তাঁকে কবিগুরুর আর একটি বিখ্যাত লেখা স্মরণ করাই—'শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস'। শ্রী মিত্র তাঁর দীর্ঘ নিবন্ধে কিছু মুসলমানের বদান্যতার কথা লিখেছেন। কিন্তু তা গরু মেরে জুতা দানের সামিল। রাজনীতিকদের কুকর্মের অনেক ফিরিস্তি তিনি দিয়েছেন; কিন্তু যে কারণটিকে কেন্দ্র করে এত বড় দুঃখজনক ঘটনা হলো সেকথা তাঁর লেখায় নেই। সাংসদ হাজি নুরুল ইসলামের নাম তিনি একস্থানে লিখেছেন; কিন্তু তাঁর সংশ্লিষ্টতার কথা চেপে গেছেন। আর একটি তুচ্ছ কথা- 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন' শব্দটি তিনি ভুল প্রয়োগ করেছেন। মিসেস শেলীর 'ডঃ ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন' বইটি পড়লে এ ভুলটি হোত না।

প্রকাশিত প্রতিবেদনটি আমাদের মনে অনেক প্রশ্ন জাগিয়েছে। এত কথা পত্রিকা ছাপবে না। সুতরাং দু'চারটি—(১) বেনাপুরের মুসলিম মহিলাদের কথা বলা হলো কিন্তু পুরুষরা কী করেছিল? (২) পূর্ব পরিকল্পনামতো জোটবদ্ধ ভাবে মুসলমানরা ব্যাপক এলাকার হিন্দুদের জখম, বাড়ী-দোকান পোড়ানো, মেয়েদের লাঞ্ছনা, লুণ্ঠন, ভাঙচুর করে কয়েক কোটি টাকার সম্পদ ধ্বংস ও ত্রাস সৃষ্টি মারফত যে সর্বনাশ করেছে,তা কি ওই বেনাপুরের দু'একজন মুসলিম মহিলার সহানুভূতিতে (যদি তর্কের খাতিরে একথা সত্য ধরে নিই) পূরণ হয়? (৩) হিন্দুরা আক্রমণকারী নয় এবং আক্রান্তও হতে চায় না;কিন্তু আক্রান্ত হলে নিষ্ক্রিয় থাকা কি স্বাভাবিক এবং তাতে কি ভবিষ্যৎ আক্রমণ বন্ধ হবে? (৪) পৃথিবীর অন্যত্র মুসলিম আক্রমণের কথা বাদ দিলেও ভারতে তারা এ পর্যন্ত হত্যা, নারীহরণ, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, ধর্মান্তরকরণ দ্বারা ভারতীয় হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার করে আসছে, হিন্দুদের যে সর্বনাশ করেছে, সুকুমারবাবুর রচনায় বর্ণিত শান্তির প্রলেপে তা কি পূরণ হবে, আক্রমণকারীরা চিরকাল বিনা প্রতিরোধে তাদের জঘন্য কাজ চালিয়ে যাবে এটাই কি শান্তির শর্ত?

প্রতিহত না হলে দুষ্কৃতকারীরা নিবৃত্ত হয় না। দুর্বলের নিষ্ক্রিয়তা দুষ্কৃতীদের উৎসাহিতই করে, শান্তি আনে না। রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনী আমাদের সেই সত্যকে দেখায়।

—অক্ষয় কুমার দাস, দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগণা।

॥ ২ ॥

১৩ সেপ্টেম্বরের স্বস্তিকায় প্রকাশিত দেগঙ্গায় মুসলিম তাণ্ডব সম্পর্কে দেশবাসীকে জানাই যে, স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতীয় মুসলিমরা পাকিস্তান দাবি করে এবং তাঁদের খুশি করতে গান্ধীজী, জওহরলালজী পাকিস্তান স্বীকার করেন। সমস্ত ভারতীয় মুসলিমদের জন্য ভারতের ২৩ শতাংশ জমি মুসলিমদের প্রাপ্য;জওহরলালের মুসলিম প্রীতির জন্য তিনি ২৩ শতাংশের স্থানে ২৭ শতাংশ জমি মুসলমানদের দিলেন। ভারতের কোনও রাজনৈতিক নেতা এর প্রতিবাদ করলেন না। অথচ পণ্ডিত নেহেরু কোনও মুসলমানকে ভারত ত্যাগ করতে দিলেন না। তাই ভারতীয় মুসলমানদের কোনও জমি ভারতে নেই। ভারতীয় সমস্ত জমি হিন্দু, শিখ ও অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের। তাই ভারতীয় মুসলিমদের জানাই যে, তাঁদের এক ছটাকও জমি ভারতে নেই।

সুতরাং ভারতের জমি দাবি তাঁরা করতে পারেন না। ভারতীয় মুসলমানরা পাকিস্তানে গেলেন না কেন? ভারতে আছেন হিন্দুদের সহিষ্ণুতায়। এই সত্যটি জানুন এবং সেই অনুসারে শান্তিতে থাকুন নতুবা আপনাদের পাকিস্তানে চলে যেতে হবে।

—হীরেন্দ্র নারায়ণ সরকার, জগাছা, হাওড়া।

মুসলিমদের দশ শতাংশ সংরক্ষণ

৮ ফেব্রুয়ারী থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর। যুদ্ধ কালীন তৎপরতায় মুসলমানদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা সম্পন্ন করে ফেলল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রাজ্য তথা দেশের সচেতন মানুষ অথবা এই দুষ্কর্মের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কেউই এটাকে প্রতিরোধ করার কোনও চেষ্টা করেননি। প্রতিবাদ যেটুকু হয়েছে তা কিছু স্বাক্ষর সংগ্রহ, সভাকক্ষে বক্তৃতাদান এবং সাহিত্য চর্চার বিলাসিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে ও তা সর্বথা অকার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই সর্বনাশ প্রতিরোধ করার জন্য দুটো মাত্র পথ আমার গোচরে এসেছে—সংঘবদ্ধ -প্রতিরোধ অথবা ন্যায়ালয়ের শরণ। আত্মকেন্দ্রিক ও অসচেতন হিন্দুদের পক্ষে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা বাস্তবে সম্ভব নয়। মাদ্রাসায় রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্যের মন্তব্যের পরে তাঁকে ধমক দিয়ে 'তওবা' করিয়ে আজকের মোল্লাচার্যে পরিণত করা বা কিছু গাড়ি পুড়িয়ে তসলিমা নাসরিনকে বিতাড়ন করার মতো সাহস হিন্দুদের হবে না। এমতাবস্থায় ন্যায়ালয়ের শরণ নেওয়াই ছিল একমাত্র পথ। কিন্তু সাড়ে সাত মাস সময়ের মধ্যেও কোনও ব্যক্তি বা সংগঠন এই কাজটি করতে পারলেন না।

এই প্রসঙ্গে অবশ্য আরও একটা প্রশ্ন মনে জাগে। সাংবিধানিক ভাবে বৈধ তপশীলি সংরক্ষণের বিরুদ্ধে পথে নামতে অনেককে দেখেছি। দেখেছি প্রতিবাদে মহানগরীর রাজপথে জুতা পালিশ করতে। গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মদাহের ঘটনাও ঘটেছে অনেক।

—মানবেন্দ্র সমাদ্দার, কলকাতা-৬৩।

দৈনিক স্বস্তিকা

যাঁরা বড়াই করে বলেন যে এক বৃন্তে দুইটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান, তাদের ওপর সরাসরি ইসলামিক চপেটাঘাতের ঘটনাটি ঘটলো অতি সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগণার দেগঙ্গায়। যেখানে শনি মন্দিরে ঐস্লামিক তাণ্ডব ও হিন্দুদের ওপর অকথ্য অমানবিক নির্যাতন ও হিন্দু রমণীদের ধর্ষণ এবং শ্লীলতাহানি'র অসংখ্য ঘটনা দু'দিন ধরে চলল প্রশাসনিক প্রশ্রয়ে ও ভণ্ড 'ধর্মনিরপেক্ষ' ডান ও বাম রাজনৈতিক দলগুলি'র সক্রিয় সহযোগিতায়। বিদেশী মিশনারী ও পেট্রো-ডলারের আনুকূল্যে মিডিয়াগুলি সঠিক সংবাদ পরিবেশন তো করলই না, উল্টে তারা হিন্দুত্ববাদী, দেশপ্রেমিক সংগঠনগুলির বিরুদ্ধেই ইতঃস্তত অপপ্রচার চালালো। সঠিক সংবাদটি একমাত্র পরিবেশিত হলো স্বস্তিকা পত্রিকার বলিষ্ঠ পদক্ষেপের দ্বারা। এই ঘটনাটিই প্রমাণ করল যে, ভারতের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিন্দুত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য স্বস্তিকা সাপ্তাহিকটি প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তাই প্রকাশনা গোষ্ঠীর কাছে একান্ত অনুরোধ স্বস্তিকা পত্রিকাটিকে অবিলম্বে দৈনিক পত্রিকাতে পরিণত করার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নিন। আশা রাখি যে সঠিক প্রচার ও আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে এটিকে দৈনিক পত্রিকা হিসেবে পরিবেশিত করা গেলে তা অচিরেই জনপ্রিয়তা লাভ করবে।

—এস ভট্টাচার্য্য, চন্দননগর, হুগলী।

বৈদিক ভারতবর্ষের বৈভব

(৮ পাতার পর)

করিতেছি। আগে পূজার আসনে ঠাকুরের বিগ্রহ থাকিত, সঙ্গে একখানি মা কালীর মূর্তি থাকিত। বেশ কিছুদিন পরে ঠাকুরের সঙ্গে মায়ের মূর্তি। এখন দেখি ঠাকুর, মা-সারদা এবং স্বামী বিবেকানন্দ আছেন।... আমাদের কথা মা-কালীকে লইয়া। যে কালীমাতা রামকৃষ্ণের সর্বস্ব ধন তাঁহার পূজা বা আসন বেলুড় তীর্থে নাই।... রামকৃষ্ণ ও কালী দুইটি বস্তু নহে, একই বস্তু। এই দুই একত্রে না থাকিলে ভারতবর্ষ হইতে কালী ও ঠাকুর দু'জনেই বিদায় নিবেন। পূজা তো আগেই বিদায় নিয়াছেন। বেলুড় মঠে একটি কালীমন্দিরও নাই।'

ব্রহ্মচারীজির কঠোর সত্যদৃষ্টি আমরা আবার দেখতে পেলাম 'রামায়ণ ও মহাভারত' শীর্ষকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রসঙ্গে। 'কৃত্তিবাসের দান ও গুণগৌরবকে কিছু মাত্র আঘাত না করিয়া বলিতেছি— স্থানে স্থানে তিনি বাল্মীকি হইতে এত দূর সরিয়া গিয়াছেন যে তাহা অতীব বেদনাদায়ক হইয়াছে। সকলেই জানেন রাজা দশরথ তাড়কা বধের জন্য বিশ্বামিত্রকে ছলনা করিয়া রাম-লক্ষ্মণের পরিবর্তে ভরত-শত্রুঘ্নকে পাঠাইয়াছিলেন। ইহা বুঝিয়া বিশ্বামিত্র ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু হায়, বাল্মীকি রামায়ণে ইহার গন্ধমাত্র নাই। বিশেষ কথা রাবণের সীতা হরণের সময় কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—

'...জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি।।
ত্রাসেতে কাঁদেন সীতা হইয়া কাতর।...

এই স্থলে বাল্মীকির বর্ণনা দেখুন—সীতা বলিতেছেন, ওরে রাক্ষসাধম—'...সিংহ ও শৃগালে যে পার্থক্য, ক্ষুদ্র খাল ও সমুদ্রে যে পার্থক্য...সারস পাখি আর শকুনে যে পার্থক্য, রামচন্দ্রের সঙ্গে তোর সেইরূপ পার্থক্য।' এই কথাগুলি সীতা কলার পাতার মতো কাঁপিতে কাঁপিতে বলেন নাই। তেজোদৃপ্তা বীর-রমণীর মতো বলিয়াছেন। বলদর্পিতা বীর রমণীকে কৃত্তিবাস লজ্জাবতী বাঙ্গালী কুলবধূ বানাইয়াছেন কোন্ বিচারে তাহা বুঝিতে পারি না। প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে যে কৃত্তিবাস অনেক কথা বলিয়াছেন যাহা বাল্মীকি বলেন নাই।'

এত বিভিন্ন শাস্ত্র, পুরাণ, দর্শন, জীবনী, ছোট ও বড় মহানামব্রতজীর লেখা সংকলনটিতে স্থান পেয়েছে যার প্রতিটির পরিচয় দেওয়া স্বাভাবিক কারণে সম্ভব নয়। তবে প্রতিটি লেখার মধ্যে আমরা তাঁর চিন্তাধারার স্বচ্ছতা, সরলতা, সত্যের প্রতি দৃঢ়তা এবং হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর নিষ্ঠা ও প্রত্যয় অনুভব করতে পারি। এগুলিরই স্বাদ স্বস্তিকার পাঠকদের নিকট পৌঁছে দিতে এই ক'টি উদ্ধৃতি।

আলোচ্য প্রবন্ধাবলী গ্রন্থটির ক্ষীর-স্বাদ গ্রহণ করিতে 'তন্ত্ররশ্মি'-ভূমিকাতে জানাচ্ছেন ঃ 'শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন, দুর্গা আর কৃষ্ণ একই। ঘটের মধ্যে জল। আর জলের মধ্যে ঘট। রাধার অন্তরে কৃষ্ণ আর কৃষ্ণের অন্তরে রাধা। জল ভরা ঘট যদি সাগরে ডুবাই, তাহা হইলে একই সময়ে জলের মধ্যে ঘট, ঘটের মধ্যে জল।'

'বাঙালীর জন্মাষ্টমী'-তে লিখেছেন ঃ 'ভাগবতের ভাষায় বলি, যাঁহারা নরগণকে পালন করেন তাঁহারা নৃপ। যাহারা পালনের মুখোশ পরিয়া পীড়ন করে তাহারা নৃপব্যাজ।'...

"সহস্রশীর্ষপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাদঃ" বেদের পুরুষসূক্তের মহামন্ত্র। একত্বের মন্ত্র। জাগৃতির মন্ত্র। ভুলিয়া গিয়াছিল তারা এই মন্ত্র এতদিন।... শির তাহার সহস্র, কিন্তু পুরুষ তিনি একজনই, মাথা তাহার পাঁচ কোটি, কিন্তু জাতি যে একটিই। এই মন্ত্রে ডাকিলেন তাঁহারা ঘুমন্ত নারায়ণকে।

'ভাগবতী কথা'-তে জানাচ্ছেন (পৃ. ২৩৪) ঃ 'অনেকে মনে করেন, ধর্ম পালন করিলে অর্থ হইবে। অর্থ হইলে কাম্যবস্তু লাভ হইবে, ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হইবে এবং জীবনের উদ্দেশ্যই ইন্দ্রিয় তৃপ্তি। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ধর্মের উদ্দেশ্য প্রেমভক্তি লাভ, অর্থের উদ্দেশ্য ধর্মলাভ, কামের উদ্দেশ্য জীবন ধারণ ও জীবন ধারণের উদ্দেশ্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা।'

তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্যই জীবনধারণ। তত্ত্ব বস্তুটি কী তাহা বলিতেছি। অদ্বয় জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। সেই তত্ত্ব একটিই—'একমেবাদ্বিতীয়ম্', তবে তাহার নাম বহু। জ্ঞানীরা বলেন ব্রহ্ম, যোগীগণ বলেন, পরমাত্মা আর ভক্তগণ বলেন— ভগবান।'

'শিশুকল্যাণে গীতার ভূমিকা' (প.-৩১৬) তিনি লিখছেন ঃ 'ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্বে প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর একদিন বলিয়াছিলেন— "টুপীওয়ালারা টুপী খুলে সেলাম ঠুকে চলে যাবে, কিন্তু যদি ব্রহ্মচর্য রক্ষা না করিস্ তবে স্বাধীনতার ভোগ হবে না।"... গীতার অপর আর একটি আদর্শ হইল লোকসংগ্রহার্থ কর্ম করা।... নিজে বড় হওয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে অপরকে বড় করা, ইহাই লোকসংগ্রহ।... লোকসংগ্রহের ভিত্তি হইল নিষ্কাম কর্ম।'

'বৈষ্ণব দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি' (পৃ. ৩২০)-তে বলেছেন ঃ 'যাঁহারা বৈষ্ণবাচার্যগণের গোষ্ঠী তাঁহাদের পথ অনুরাগের পথ। তাঁহারা বলেন, প্রগাঢ় ভালবাসা যখন নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে প্লাবিত করিয়া ফেলে তখনই অখণ্ড সত্তার আস্বাদন ঘটে।... এই পুরুষোত্তমতত্ত্বের আস্বাদনানুভূতির ভিত্তিভূমি হইতে বিশ্বজগৎটাকে যেরূপ দেখা যায় তাহাই বৈষ্ণবদর্শন।'

পরম উদর, মুক্তমনা ব্রহ্মচারীজির লিখিত প্রবন্ধ, পত্র, পুস্তকের ভূমিকা বা ভাষণ— যে কোনও স্থান হইতে যে কোনও বিষয়ই পড়া চলতে পারে এতই সাবলীল ও আকর্ষণীয় তাঁর প্রকাশভঙ্গী। গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। মূল্য নয়, মাধুকরী ঃ ১৬০.০০ (একশত ষাট) টাকা। আশা করি পাঠকেরা আস্বাদন করবেন পবিত্র ক্ষীরসাগরের ক্ষীর। স্বাদ পদে পদে।

শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী (১ম খণ্ড)
সংকলক ঃ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী
প্রকাশক ঃ শ্রী মহানামব্রত জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন পরিষৎ
শ্রীশ্রী মহানামঅঙ্গন, রঘুনাথপুর (বাগুইআটি), কলিকাতা-৫৯

পরম্পরা

আধুনিক বিজ্ঞানের চোখে আদ্যাশক্তি মা কালী

রঞ্জন ঘোষ

হিন্দুধর্মের অনুগামীদের আমরা পৌত্তলিক বলে অপবাদ দিই। বাস্তবিকপক্ষে হিন্দুরা পৌত্তলিক নয়। পৌত্তলিক তারা যারা পুতুল পূজা করে। হিন্দুরা পূজা করে প্রতিমা। 'প্রতিমা' স্ত্রী লিঙ্গ, 'প্রতিমা' শব্দ এসেছে 'প্রতিম' থেকে। 'প্রতিম' মানে 'Like';যেমন অনুজ প্রতিম অর্থাৎ অনুজের মতো, ভ্রাতৃ প্রতিম অর্থাৎ ভাই-এর মতো, তেমন কোনও ভাবের প্রতিম হিসাবে প্রতিমা। প্রত্যেকটা প্রতিমা লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এর মধ্যে রয়েছে এমন একটা শিল্প ব্যঞ্জনা যা অসীম অনন্ত কোনও ভাবকে প্রকাশ করে। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় 'Infinite suggestion'। পদার্থ বিজ্ঞানে $E=mc^2$ যেমন বিজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশিত একটা তত্ত্ব, তেমন প্রত্যেকটি প্রতিমা এক অসীম তত্ত্বের ঘনসংবদ্ধ রূপ (Compressed Language)। বিস্তৃত বক্তব্য বিষয়কে বিজ্ঞান যেমন Code Language-এ ছোট করে আনে বিভিন্ন প্রতীকের মাধ্যমে, তেমনি আমাদের পুরাণকাহিনী এবং ভাস্কর্যও ছোট হয়ে আমাদের মধ্যে বিরাজ করে $E=mc^2$-র মতো।

কালী মূর্তি হলো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশে শক্তির আদি পর্যায়। বিজ্ঞানের ভাষায় Primodial Energy, আমাদের ভাষায় আদ্যাশক্তি (আদির স্ত্রীলিঙ্গে আদ্যা)। আধুনিক Quantum Physics বলছে, আদিতে সবই এক মহা অন্ধকারের মধ্যে ঘনীভূত হয়েছিল—"In the very begining everything was resting in perpetual darkness; night oppressed every thing like an inpenetrable thicket" (Cosmos-Carl Sagan P 212)। এই ঘনীভূত অবস্থা যখন আরও ঘনীভূত হতে চেষ্টা করে তখন চাপ এতটাই বেড়ে যায় যে সেই চাপ বা Compression সহ্য করতে না পেরে তা ফেটে যায়। সেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ থেকেই জগৎ (সম্প্রসারণশীল ব্রহ্মাণ্ড) বেরিয়ে আসে। এটাই Black Hole Theory। এই Compression থেকে যে বিস্ফোরণ হয়েছিল, Astrophysics-এ তা Big Bang Theory বা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব নামে পরিচিত। সেই বিস্ফোরণের ফলে আজও ব্রহ্মাণ্ড প্রচণ্ড বেগে কেন্দ্র থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। (এই জন্যই জগৎ ঈগম্ ধাতু থেকে এসেছে যার অর্থ হল বর্দ্ধমান। বিজ্ঞানও বলছে আমাদের Universe স্থির নয়, Expanding অর্থাৎ বর্দ্ধমান) ব্ল্যাকহোলের অভ্যন্তরে ঢুকে গেলে এক বিন্দু প্রমাণ অবস্থায় উপস্থিত হতে হয় যে বিন্দুপ্রমাণ স্থানের ঘনত্ব পরিমাপহীন। ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্রই এই বিন্দুপ্রমাণ অবস্থা 'Singularity' নামে পরিচিত। এটা স্পষ্ট ধারণার মধ্যে আনা যায় না। এটা এক শূন্যতা, এই তথাকথিত শূন্যতা, শূন্যতা নয় আপাত শূন্যতা False Vaccum, বা অতিশূন্যতা Supervoid (GUT, Grant Unifield Theory অনুসারে)। সত্য সম্পর্কে চিন্তা করতে গেলে শেষ পর্যন্ত এই অতিশূন্যতায় পৌঁছাতে হয় তবে এই অতিশূন্যতা একেবারেই যে কিছু নয় তা নয়। জগতের উৎপত্তির কারণ এর মধ্যে নিহিত আছে। এই শূন্যতা থেকেই শক্তির উদ্ভব। (বিজ্ঞানে Vaccum fluctuation in Quantum field তত্ত্বদ্বারা প্রমাণিত, Astrophysicist Stephen Hawking-এর মতেও Total energy of the universe is exactly Zero), আর শক্তি থেকেই বস্তুর আবির্ভাব, ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্র বা Singularity থেকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির চাপের ফলে যখন ঘনীভূত শক্তি প্রচণ্ডভাবে বিস্ফোরিত হয়ে গোলক আকারে ছড়িয়ে পড়ে, তখন এই শক্তি থেকে অণু বা particle নিয়ে আকাশ তৈরি করে বাইরের দৃষ্টিতে ধরা দিতে পাঁচ লক্ষ বছর সময় নিয়েছিল। কেন্দ্র থেকে বিস্ফোরিত হয়ে বস্তুকণা সৃষ্টি করার আগে শক্তি এমন অবস্থায় ছিল যে তার অনুমান করা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। সেই শক্তি বৃহত্তর মধ্যে আলো দর্শন ছিল অসম্ভব। শক্তি এই অন্ধকার বৃত্ত পার হতে আলোর গতিতে ছুটেও তিন থেকে পাঁচ লক্ষ বছর নিয়েছিল বর্ণের আকারে দৃষ্টিগোচর হতে। অন্ধকার এই দুর্জ্ঞেয় বৃত্তকেই কালো বর্ণ দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই জন্যই এই শক্তি বা মূর্তি আমরা যাকে কালী বলি, তার বর্ণ কালো। সুতরাং দর্শনযোগ্য হবার পূর্বের এই ধাবমান অন্ধকার, তাকেই বলি আদ্যাশক্তি, এই আদ্যাশক্তিই কালী। সুতরাং মনে রাখতে হবে মায়ের গায়ের রঙ কালো বলে, দেবীর নাম কালী নয়, টাইম বা কালের জন্মদাত্রী বলেই দেবীর নাম কালী। তাঁর উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই কাল বা সময়ের উদ্ভব হয়েছে। এই আদ্যাশক্তিই কালের জননী। কালের জননী হিসাবে তাঁর নাম কালী।

বিস্ফোরণের সময় একত্রে সমাবেশিত শক্তি, চারাটির শক্তিতে বিচ্ছিন্ন হতে দেখা যায়, Quantum Physics-এ যাকে বলে Symmetry Breaking। এই শক্তি চারটির নাম— (১) মহাকর্ষীয় বল (Gravitational Force) (২) সবল পারমাণবিক বল বা সবল মিথস্ক্রিয়া (Strong Nuclea Force বা Strong Interaction) (৩) দুর্বল পারমাণবিক বল বা দুর্বল মিথস্ক্রিয়া (Weak Nuclear Force বা Week interaction) (৪) তড়িৎচুম্বকীয় বল (Electromagnetic Force)। এই শক্তি চারটি কালীর চারটি হাত হিসাবে দেখানো হয়। অন্তর্নিহিত চারটি শক্তি বিস্ফোরণের ফলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে অনুভূতিগ্রাহ্য হয়েছিল, তাই তার চার হাত রূপে কল্পিত হয়েছে। Electromagnetic Force সৃষ্টির সহায়ক। তাই মায়ের বাম দিকের নিম্ন দিকের যে হাত যাতে মুণ্ড ধৃত রয়েছে সেই হাতই হলো সৃষ্টির প্রতীক Electromagnetic Force। সৃষ্টির পর শক্তিকে যে হাত বরদান করে ধরে রাখে সেই উপরের দিকে ডান হাতের নাম হলো— Strong Nuclear Force। যে হাত অভয় দান করে অর্থাৎ ধ্বংস হতে দেবে না এই ভরসা দেয় সেই হাত রয়েছে ডান দিকের নীচের দিকে। সেটাই হলো Gravitational force এর প্রতীক। আর যে শক্তি ধ্বংস করে সেহ× Weak Nuclear Force রয়েছে বাম দিকের উপরের হাতে, যে হাতে রয়েছে খড়্গ। মহান বিজ্ঞানী আইনস্টাইন সারাজীবন ধরে এই চারটি মূলক্ষেত্রকে একীভূত করতে চেয়েছিলেন। এই চারটি বলকে সমন্বিত করে একটি অভিন্ন বলের মধ্যে বিধৃত করার প্রয়াস বিজ্ঞানী মহলে বহুদিন ধরে চলে আসছিল। এই পরিকল্পিত তত্ত্বেরই নাম হলো—Grant Unified Theory বা সংক্ষেপে GUT, হকিং এর ভাষায়— 'Ultimately, most

physicists hope to find a unified theory that will explain all four forces as different aspects of a single force. Indeed many would say this as the prime goal of Physics today.' (Brief History of time P. 74)। হাজার হাজার বছর আগে ভারতীয় ঋষি-বিজ্ঞানীরা জানতেন এই চারটি আসলে একই অভিন্ন শক্তি—The ultimate reality এই বিশ্বের নিয়ন্ত্রক। তাঁরা এই বিভাজিত চারটি শক্তিকে আদ্যাশক্তির মধ্যে একীভূত হতে দেখেছিলেন। বর্তমান বিজ্ঞান বলছে এই বিশ্বের প্রত্যেকটি পদার্থের পিছনে রয়েছে ম্যাটার এনার্জি (Matter is nothing but energy, আইনস্টাইনের $E=mc^2$ সূত্র অনুযায়ী)। প্রত্যেকটি পদার্থকে নিয়ন্ত্রণ করছে ফিল্ড এনার্জি, তারই ফলে সৃষ্টি হচ্ছে এই পরিমণ্ডল, ঘটনাস্রোত, প্রতিবেশ, একেই বৈদিক ঋষিরা বলেছিলেন লীলা অর্থাৎ প্রকাশ। সবকটি ফিল্ডই উৎসারিত একটিই উৎস হতে (All the force fields come from single field)—আইনস্টাইন এই স্বপ্নই দেখতেন। তার জীবনের শেষ তিরিশ বৎসর ধরে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন এই চূড়ান্ত সত্য। যে সব ফোর্সফিল্ডই উৎসারিত একটি অন্তিম ফিল্ড থেকে, তাঁর আবিষ্কৃত The Theory of Relativity এবং Quantum Theory-তে তাঁর পরবর্তী অবদান— উভয়ের সমন্বয়ে পরের যুগের বিজ্ঞানীরা তৈরি করলেন Relativistic Quantum Field Theories। এরই সাহায্যে শেষ পর্যন্ত সম্ভব হলো আইনস্টাইনের স্বপ্নকে প্রমাণ করা অর্থাৎ সেখানে সব ফোর্স ফিল্ডই আসছে একটি উৎস হতে, এই উৎস যেখানে সব ফোর্স ফিল্ড মিশে যাচ্ছে— তাকেই বলা হলো ইউনিফায়েড ফিল্ড, পদার্থবিজ্ঞানীরা এই ইউনিফায়েড ফিল্ড-এর ধারণার স্বীকৃতি জানিয়েছেন। ইউনিফায়েড ফিল্ডই বিশ্বের সৃষ্টির উৎস।

আগেই বলেছি, কালী মানে আদিশক্তি (Primordial Energy) যা শূন্য থেকে প্রথমে ছুটে বেরিয়ে এসে সময়ের সূচনা করেন। পুরুষের বুক থেকে শক্তির উদ্ভব হয়েছে। এই পুরুষ যিনি মূলত ক্রিয়াহীন তথাপি অব্যক্তভাবে নিজের ভিতর থেকে শক্তিকে নির্গত করে শবের মতো পড়ে আছেন, শক্তি বিচ্ছুরিত করে দেবার পর তার উৎস স্থির হয়েই যায়। যেমন মানব দেহের Energy বেরিয়ে গেলে সেই দেহ নিস্তব্ধ হয়— কোনও কিছুতেই আর সাড়া দেবার ক্ষমতা থাকে না। তখন মানব দেহকে শব বলা হয়। শক্তিকে বিচ্ছুরিত করে দেবার পর মায়ের পায়ের নীচে শিবও তেমনই শবাবস্থায় বিরাজ করেন। শিবই হলেন পরমপুরুষের প্রতীক অর্থাৎ পরমশূন্যতার প্রতীক। তাঁর থেকেই দেবী তথা শক্তির উদ্ভব এবং তাতেই শেষ পর্যন্ত তিনি লয় পাবেন তন্ত্রমতে যাকে বলে মৈথুন,—দেবীর সঙ্গে পুরুষের মৈথুন হবে অর্থাৎ শূন্যের সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটবে। শক্তি হলো ঈশ্বর অর্থাৎ শিবের তেজ। শক্তিকে স্ত্রী লিঙ্গ হিসাবে কল্পনা করা হয়। সেইজন্য সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতির সঙ্গে এর যথেষ্ট মিল আছে। শক্তি রূপ পরিগ্রহ করেছে মা কালীর অবয়বে। এই যে অতিশূন্যতা বা 'supervoid' যাকে পরমব্রহ্ম বলতে পারি, তাই-ই পুরুষ। তাই পুরুষের সঙ্গে দেবীর মিলন বিজ্ঞানের ভাষায় power in deep embrace with the supervoid—এটাই মৈথুনের সম্পর্ক। দক্ষিণা কালীর ধ্যানমন্ত্রে আছে—'মহাকালেন চ সমং, বিপরীত রতাতুরাম'—দেবী মহাকালের সঙ্গে বিপরীতরতিতে নিরতা আছেন, এই পুরুষ বা শিবের সঙ্গে কালীর সম্পর্ক বিপরীত রতিক্রিয়ার। এর অর্থ পরমশূন্যতারূপ পুরুষের বুক থেকে নির্গত হয়ে পুরুষকে আবৃত করেই অর্থাৎ নীচে পুরুষ উপরে শক্তি এইভাবে থেকে এই শক্তি জগৎ প্রসব করেছিলেন। পুরুষের এই ধরণের সম্পর্কেই বিপরীত রতিক্রিয়া বলা হয়েছে। যে রতিক্রিয়ায় নারী ক্রিয়াশীলা আর পুরুষ নিষ্ক্রিয় মানবীয় ব্যাপারে তাকেই বলা হয় বিপরীত রতি। এই অর্থে নির্গুণা কালী যখন সগুণা হন তখনই তিনি বিপরীতরতা। এই যে শক্তি, মহাশূন্যতা (Super void) থেকে বা প্রথম নির্গত হয়েছিলেন তাই আদিশক্তি অর্থাৎ আদ্যাশক্তি। কৃষ্ণগহ্বর থেকে বেরিয়ে আসা শক্তি আলোর আকারে বেরিয়ে আসে ধাপে ধাপে লাফিয়ে লাফিয়ে। ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়াকেই বিজ্ঞানের ভাষায় বলে— Quantum Leap. শক্তি বস্তুজগতে প্রথম উপাদান তৈরি করেছিল একান্নটি কোয়ান্টাম লীপে এগিয়ে এসে। এই যে একান্নটি লীপ তাই মুণ্ড। তরঙ্গের বিভিন্ন বর্ণ (colour) আছে। সেই তরঙ্গ গুলিই সংস্কৃতের একান্নটি বর্ণ। আদি বর্ণ হলো পরাবর্ণ, নিষ্ক্রিয়বর্ণ;সুতরাং বাইরে তার কোনও প্রকাশ নেই। ফলে পঞ্চাশটিই দর্শনযোগ্য। এই পঞ্চ াশটিই সংস্কৃতের পঞ্চাশটি বর্ণ। সেইজন্য সংস্কৃত বর্ণমালায় পঞ্চাশটি বর্ণ 'অ' থেকে 'ক্ষ' পর্যন্ত এই পঞ্চাশটি বর্ণের মালাকে বলা হয় অ-ক্ষ মালা। কালীর গলায় মুণ্ডমালাকে সত্যি সত্যি মানুষের মুণ্ডের মালা ভাবতে গেলে তা অর্থহীন হয়ে যাবে। কেননা বলা হয়ে থাকে আদ্যাশক্তি মা কালী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্বে মা কালী মানুষের মুণ্ড পেলেন কি করে? তাছাড়া মুণ্ডমালার সব কটির বর্ণই ভিন্ন ভিন্ন, যেহেতু এক একটি মুণ্ড এক একটি frequency-র প্রতীক সেই জন্যই বর্ণের এই তারতম্য।

মায়ের দেহে কোনও পাশ বা বস্ত্র নেই বলে তিনি বিবস্ত্রা অর্থাৎ উলঙ্গ। এ বস্ত্র কোনও স্থূল দেহের নয়, সূক্ষ্ম দেহের। ষড় রিপুই হলো সে বস্ত্র যা আত্মাকে আবৃত রাখে। তিনটি গুণ থেকেই ষড়রিপুর উদ্ভব। এই গুণত্রয় হলো সত্ত্ব, রজ ও তমো যা আমাদের বিজ্ঞানে three fundamental particles – neutron, electron and proton— আদ্যাশক্তিকে কোনও particle সৃষ্টি হয় না। vertual কণার দল আচমকা লাফিয়ে উঠে নেচে বেড়ায়, আবার ডুবে যায়। যথেষ্ট শক্তি না থাকায় তারা তখনও প্রকৃত কণা হতে পারে না, ফলে কোনও particle সৃষ্টি হয় না। particle উদ্ভব হলেই তারা পারমাণবিক সংযোগে অণু তৈরি হয়। তখন জগৎ গুণের অধীন হয় অর্থাৎ পাশ দ্বারা বদ্ধ হয়। এই পাশই বস্ত্র। আদ্যাশক্তির তথা আদিশক্তি (primordial energy)-র এই পাশ বা বস্ত্র নেই বলেই তিনি বিবস্ত্রা অর্থাৎ উলঙ্গ। এখানে বলে রাখা দরকার, বিজ্ঞানের ভাষায় virtual particle। এর সংজ্ঞা হিসাবে বলা হয়— vertual particle is a particle that can never be detected but whose existence does have measurable effect। তাই বলা যায় মা কালীর এই মূর্তি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব তথা আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রতীকমাত্র।

বৃদ্ধাবাসের আবাসিকদের দুর্গোৎসব

ইন্দিরা রায়

অক্টোবরের ১ তারিখে উদ্‌যাপিত হয় বিশ্ব প্রবীণ দিবস। হয়তো অনেকের কাছেই এই দিনটি অজানা। ১৯৯১-র রাষ্ট্রপুঞ্জ অক্টোবরের এক তারিখকে 'বিশ্ব প্রবীণ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। উনিশ বছর ধরে এই দিনটি কার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ জানা নেই। তবে হ্যাঁ, আমাদের সামাজিক কাঠামোয় কোনওদিন এই দিনটি এভাবে চিহ্নিত হবে ভাবা যায়নি। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে সংসারে, সমাজে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ক্রমশ উপেক্ষিত হচ্ছেন। অভিজ্ঞতায় তারা প্রবীণ হলেও শ্রদ্ধা ও মর্যাদার আসন থেকে তাঁরা ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছেন, যার জন্যই সংসারের চৌহদ্দির বাইরে তাঁদের স্থান হচ্ছে 'বৃদ্ধাশ্রম'-এ। বৃদ্ধাশ্রমের ধারণা আমাদের সমাজে কখনও ভাবা যেত না। যৌথ পরিবারে বাড়ির প্রবীণরাই অভিভাবক হিসেবে মর্যাদা পেতেন এবং তাঁদের কথা শুনেই সংসারটা পরিচালিত হোত। বৃদ্ধাশ্রম-এ যারা থাকছেন অর্থাৎ থাকতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা নিজের হাতে গড়া শান্তির নীড় ছেড়ে দিয়েই সেখানে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রথম প্রথম এই ধারণাকে বাস্তবায়িত করা দুষ্কর ছিল এবং আজকে দেখা যায় কলকাতা, শহরতলি এবং আরও দূরে গড়ে উঠছে 'বৃদ্ধাশ্রম' তাদের শান্তির নীড় হিসেবে।

প্রকৃতির নিয়মে একের পর এক ঋতু ফিরে আসে। আর এই ঋতুর আনাগোনা প্রবীণদের মনকে নষ্ট্যালজিয়ায় ভরিয়ে তোলে। বিশেষত, দুর্গোৎসব বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব—সে সময়কার দিনগুলো নিশ্চয়ই ফিরে ফিরে আসে ফ্ল্যাশব্যাকে। এই ফ্ল্যাশব্যাকের ছবিগুলো দেখে তারা বর্তমান সময়কালটাকে কীভাবে মেনে নেন?

কর্মসূত্রে এবং চেনা পরিচিতজন বৃদ্ধাশ্রমে থাকার সুবাদে অনেকগুলো বৃদ্ধাশ্রমে যাবার সুযোগ হয়েছিল। এই দুর্গোৎসবে তাঁরা কেমন আছেন, কেমন থাকবেন তাঁদের কি ভাবনা— সেসব জানতে পরিচিত সেই সব মহিলাদের আছে গিয়েছি।

ফুলমণিদেবী অত্যন্ত হাসিখুশি প্রাণবন্ত একজন প্রবীণা। বাইরের চেহারায় তাঁকে প্রবীণ মনে হলেও, কিন্তু মনের দিক থেকে অত্যন্ত প্রাণবন্ত নবীন। পুজো তো এসে গেল, কী মনে হচ্ছে, কেমনভাবে কাটাবেন—'হ্যাঁ, পুজো আসছে মানেই তো মা আসছেন। মনটা একটু আধটু কেমন করে যখনই আগের কথা ভাবি। তবে সে সব কথা ভাবলে প্রথম প্রথম শুধু

কষ্ট পেতাম। এত বছর বাড়ি ছেড়ে থাকার ফলে এখন আর কিছু মনে হয় না। আমাদের এখানেও পুজোর দিনগুলো বিশেষভাবে কাটানো হয়। ঠাকুর দেখতে নিয়ে যায়। আর নতুন কাপড়? সে তো আমার ভাই, মেয়ে দিয়ে যায়। আর কি চাই?' হুগলির চুঁচুড়াতে রামকৃষ্ণ বৃদ্ধাশ্রমে এক আত্মীয়া থাকার সুবাদে গিয়েছিলাম। সেখানে মন্দাকিনী নন্দী, যিনি স্বামী মারা যাবার একবছর পরই নিজের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার্থে চলে আসেন বৃদ্ধাশ্রমে। বললেন 'ছেলে-মেয়েরা থাকা সত্ত্বেও। প্রথম প্রথম নিজের সাজানো সংসারের জন্য খারাপ লাগত, এখন দু'বছর হলো বাড়ি যাইনি। এখানেই থাকবো। এখান থেকে কাছেই রামকৃষ্ণ মঠে নিয়ে যায়। ওখানেই অঞ্জলি দেব।'

এখানকার আরেকজন অশীতিপর বৃদ্ধা কনকপ্রভা সেন মন ও শরীরে বলিষ্ঠ। পুজোর ক'দিন কি করতে ইচ্ছে করছে, বাড়ি যাবেন নাকি? সব প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে উত্তরটা শ্রীমার বিখ্যাত উক্তি দিয়ে জানিয়ে দিলেন— যেখানে যেমন সেখানে তেমন। যখন যেমন তখন তেমন। একগাল হাসি হেসে বললেন, আমি স্বেচ্ছায় এসেছি। আমার ছেলেরা আছে, নাতনিরা আছে। কিন্তু এখনকার ছেলেমেয়েরা সবাই বিদেশে। তাই আমি স্বেচ্ছায় চলে এসেছি।

উত্তরপাড়ার হোমের একজন মাসিমা পুজোর আগেই বিশেষ কারণে বাড়ি এসেছেন, যাবেন পুজোর পরে। ওনার কিন্তু পুজোর সময় হোমের কথা খুব মনে পড়ে। কারণ, এখন বাড়ির তুলনায় একই মানসিকতার মানুষগুলোই বেশি আপনার হয়ে গেছে।

ভাইফোঁটা, কালীপুজো এসব বিশেষ দিনগুলো এখন অনেক বেশি উজ্জ্বল এবং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে আবাসিকগুলোর বাসিন্দাদের কাছে' জানালেন সেখানকার অন্যতম এক কর্মকর্তা। "কারণ এখানে যাঁরা থাকেন, তাদের কারও না কারও ভাই আছে। বাড়িতে কালীপুজোর চল আছে। অথবা জগদ্ধাত্রীপুজোর আরাধনা হোত বা হয়। বাজি পোড়ানোর সেই আলো ঝলমলে দিনগুলোকে আবার ফিরে পেতে যতটা সম্ভব তার আয়োজন করি। আবাসিকাদের মুখে হাসি, চোখ দুটিতে উজ্জ্বল চাহনি দেখলে আমাদেরও ভাল লাগে।"

বেশ কয়েকটা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার এইসব আবাসিকাদের নিয়ে বিভিন্ন প্যাণ্ডেলে প্রতিমা দর্শন করাতে নিয়ে যান। পুজোর অঞ্জলি দেওয়ান। যে অনুভূতি আজ আত্মজদের হওয়ার কথা, তাদের জন্মদাত্রীদের প্রবীণ বয়সে যেটুকু স্বাচ্ছন্দ্য, সহায়তা, সঙ্গদান করার কথা—সেই কাজ করছেন সংগঠনকর্মীরা। কিন্তু তবুও তাঁরা মা, সন্তানের জননী তাই আজকের বিশ্বপ্রবীণ দিবসে তাদের আকুতি দেবীর কাছে সন্তানের মঙ্গলের জন্য। তাঁদের কিছু উপবাস, নিয়মনিষ্ঠা, তা পরিবার থেকে বাইরে থেকেও সেইসব পারিবারিক সদস্যদের জন্য। এমনকি আজকের দিনে আবার ফিরে যেতে চায় মন সন্তানের পাশে।

কিন্তু এ আবেদন অনেকেই মানতে চাইছেন না বিশেষতঃ বৃদ্ধাবাসে রয়েছেন দীর্ঘদিন এমন কিছু আবাসিকা। তাঁদের বক্তব্য— "নিজের সম্মান নিজের মর্যাদা বজায় রেখে যতদিন বাঁচব, এখানেই থাকব। এখানে যারা আছেন, তারা সবাই সমব্যথী একই পরিবারের মতো। তাদের পারস্পরিক ভালবাসা, শ্রদ্ধা পাই, তা অনেক আনন্দের, সন্তানের করুণার দৃষ্টি এবং ভিক্ষার দানের চেয়ে।" তাই তাঁরা গড়ে তুলেছেন নিজস্ব সমাজ যেখানে 'একলা চল রে' হাতে হাত মিলিয়ে সারা বছর মনের আনন্দে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাওয়া সম্মুখে শান্তি পারাবারের পথে।

।। চিত্রকথা ।। পরশুরাম।। ১২

কলকাতায় জম্মু-কাশ্মীরের ভারতভুক্তি দিবস উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ জম্মু-কাশ্মীরের বর্তমান সমস্যার জন্য দায়ী তিনজন— মাউন্টব্যাটেন, জওহরলাল নেহরু এবং 'শেখ আবদুল্লা।' গত ২৬ অক্টোবর সন্ধ্যায় কলকাতায় মহাজাতি সদন সভাগৃহে এরকমই মন্তব্য করেন পাঞ্জাব পুলিশের প্রাক্তন ডিজি, পি সি ডোগরা। তিনি কাশ্মীরের ভারত ভুক্তি উদ্‌যাপন সমিতি, কলকাতা কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে ভাষণ দিচ্ছিলেন। শ্রীডোগরা বলেন, মাউন্টব্যাটেন ভারতের ভাইসরয় থেকেও পাকিস্তানের পক্ষেই সবকিছু করে গেছেন। ১৯৪৭ সালের ঘটনাপ্রবাহের বিষয়ে বিভিন্ন অবসরপ্রাপ্ত সেনা আধিকারিকদের লেখা বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি জানান, সেনাবাহিনীর বৃটিশ অফিসাররা ভারতীয় বাহিনীকে বিপথচালিত করেছিল। সেদিন এমনকী আজও যদি আমাদের মুজফ্‌ফরাবাদ (পাক অধিকৃত কাশ্মীরে) আমাদের সেনারা দখল করে তাহলেই পাকিস্তান সবরকম চাপে পড়ে যাবে। এদিনকার সভার অন্যতম বক্তা প্রবীণ সাংবাদিক অসীম কুমার মিত্র বলেন, কাশ্মীরের ভারতভুক্তিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর (শ্রীগুরুজী) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলের অনুরোধে যে অপ্রতিম ভূমিকা পালন করেছিলেন, তিনদিন (১৭-১৯ অক্টোবর, '৪৭) লাগাতার কথাবার্তা বলে মহারাজা হরি সিংকে ভারতে যোগ দিতে রাজী করিয়েছিলেন তার উল্লেখ প্রায় কেউই করেন না। এটা একশ্রেণীর সংবাদমাধ্যমের বিকৃত মানসিকতার ফল। সম্প্রতি দিল্লীতে গিলানীর পাঁচদফা দাবীর অন্যতম — 'আফজল গুরুসহ সকল কাশ্মীরী সন্ত্রাসবাদীকে মুক্তি দিতে হবে' বলে কেন্দ্র সরকারকে তীব্র সমালোচনা করেন শ্রীমিত্র।

সভার অন্যতম বক্তা প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও সুলেখক অধ্যাপক তথাগত রায় এন ডি এ সরকারের সময়ে গৃহীত বিদেশনীতি 'সফট্ টক উইথ বিগ স্টিক' বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কারগিল যুদ্ধে জয়লাভ ও বিশ্বশক্তির সমর্থনের কথা তুলে ধরেন।

সভার শেষ বক্তা প্রাক্তন আই পি এস ডঃ বাণীপদ সাহা মধ্যস্থতাকারী দিলীপ পাডগাঁওকরকে ফিরিয়ে নেওয়ার দাবী জানান। এদিনকার সভায় পৌরোহিত্য করেন প্রাক্তন সাংসদ (টি এম সি) ডাঃ বিক্রম সরকার।

ধন্যবাদ জানান, সভার আহ্বায়ক এবং সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন সংস্কার ভারতীর কসবা শাখা এবং সঙ্গীত শিল্পী সর্বাণী সান্যাল ও শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী। সভা পরিচালনা করেন শক্তিশেখর দাস।

(বাঁ দিক থেকে) বিশ্বনাথ মুখার্জী, ডঃ বাণীপদ সাহা, ডাঃ বিক্রম সরকার, পি সি ডোগরা, তথাগত রায় ও অসীম কুমার মিত্র।

এটিএস চার্জশীটে অভিযুক্ত নন ইন্দ্রেশকুমার

(১ পাতার পর)

আন্দোলনে বিশ্বাসী নয়।"

বিজেপি-র মুখপাত্র নির্মলা সীতারামন ইন্দ্রেশকুমারের বক্তব্যকে সমর্থন করে বলেছেন, "আমাদের প্রাপ্ত সূত্র মতেও চার্জশীটে ইন্দ্রেশকুমারের নাম অভিযুক্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। তার বিরুদ্ধে কোনও প্রকৃত তথা বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ নেই। কোনও সংগঠনের নামও ওই চার্জশীটে নেই। তাই আর এস এস বা বিজেপি সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত তা কিভাবে বলা যাবে?"

তাঁর বক্তব্য, ইন্দ্রেশকুমারের বিরুদ্ধে যারা বলছেন, তারা আদপে চার্জশীটটা পড়েই দেখেননি। সেখানে আর এস এসের কোনও নামগন্ধ নেই।

অন্যদিকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সাধারণ সম্পাদক প্রবীণ ভাই তোগাড়িয়া ইন্দ্রেশকুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগকে মুসলিম ভোট প্রাপ্তির লোভে ইউপিএ সরকারের হিন্দু সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে বৃহত্তম রাজনৈতিক চক্রান্ত বলে বর্ণনা করেছেন।

বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, কংগ্রেস কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকলে সিবিআইয়ের তদন্তকে প্রভাবিত করে থাকে। তাই এটা এমন কিছু নয়। তাঁর বক্তব্য, আর এস এস যদি সন্ত্রাসবাদী হয় তা হলে লালকৃষ্ণ আদবানী, অটলবিহারী বাজপেয়ী, রাজনাথ সিংহরাও সন্ত্রাসবাদী। এই সঙ্গে তিনি কংগ্রেসকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, যখনই কংগ্রেস আর এস এসের উপর আঘাত হেনেছে, তখনই ওদের বিপদ হয়েছে। রাজনাথের কথাটা যে ফাঁকা আওয়াজ নয়, ওয়াকিবহাল ব্যক্তিমাত্রই তা জানেন।

১৯৭৫-এ আর এস এসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার ফলে কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধী সরকারের পতন হয়েছিল। আর ১৯৯২-তে একই পদক্ষেপ এন ডি এ সরকার গঠনের পথকে প্রশস্ত করেছিল।

অরুন্ধতীকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না কেন?

(১ পাতার পর)

বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উৎসাহ ও সমর্থন জানানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অরুন্ধতী রায়, সুজাতা রাও এবং গিলানির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন? লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের সময় বিজেপি-র বরুণ গান্ধীকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযোগ, তিনি 'হেট মুসলিম' ক্যাম্পেন করেছেন। যদিও আদালতে এই অভিযোগ খারিজ হয়ে যায়। অরুন্ধতী রায়েরা নিঃসন্দেহে 'হেট ইন্ডিয়া' ক্যাম্পেন করেছেন। তবে মনমোহন সিং সরকারের পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করবে না কেন? অরুন্ধতী রায়েরা কি আইনের ঊর্ধ্বে? খোদ দিল্লিতে বসে ভারত-বিরোধী প্ররোচনা দেওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকারের কী উচিত নয় সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার ফিরিয়ে নেওয়া?

অরুন্ধতী রায় বড় কলমবাজ হতে পারেন কিন্তু তাঁর ইতিহাস জ্ঞান অতি সীমিত। যেমন, ভারত একটি ভুখে নঙ্গে মানুষের দেশ। একদা ইয়োরোপ আমেরিকার অর্ধ শিক্ষিত সাহেব-মেমদের এমনটাই ধারণা ছিল। অরুন্ধতী যদি সাম্প্রতিককালের পত্র-পত্রিকা পড়তেন তবে নিশ্চয় এমন ৫০ বছরের পুরানো বস্তাপচা তথ্য দিয়ে সেমিনারে ঝড় তোলার চেষ্টা করতেন না। তিনি জানতে পারতেন যে, অর্থনৈতিক শক্তির বিচারে ভারত এখন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র। ভারতীয় শিল্পপতিরাই বিশ্বের প্রথম দশজন বিত্তবানের স্থানগুলি দখল করে নিচ্ছেন। তাই ভারত শুধুই ভুখে নঙ্গে জনতার দেশ এমন তথ্য বুকার পুরস্কারে সম্মানিত লেখিকা কোথায় পেলেন? যে পাকিস্তানের ওকালতনামা তিনি নিয়েছেন তাঁর জানা উচিত যে পাকিস্তানের সমস্ত শিল্পপতিদের মিলিত সম্পদ ভারতের দুই আম্বানি ভাইদের থেকে কম। তাই পাকিস্তানকে ভুখে নঙ্গে জনতার রাষ্ট্র বললে তিনি ভুল করতেন না।

অরুন্ধতী রায় বলেছেন, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়। ঐতিহাসিক কাল থেকেই কাশ্মীর একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। এমন আজব ইতিহাস তিনি পড়লেন কোথায়? কোন সাহেব বা মোল্লার লেখা সেই ইতিহাস? তাঁর জানা উচিত ছিল মহাভারতে কাশ্মীরের উল্লেখ আছে। তবে মাওবাদী লেখিকা বলবেন, রামায়ণ মহাভারত ইতিহাস নয়। কল্পিত কাহিনী। ভাল কথা। আধুনিক ইতিহাসের কথাই বলা যাক। ২৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দের অশোকের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে সম্রাট অশোক কাশ্মীরে শ্রীনগরী নামে একটি নগর পত্তন করেছিলেন। সপ্তম শতকে কাশ্মীরের রাজা ছিলেন ললিতাদিত্য। তাঁর পরবর্তীকালে কাশ্মীরের হিন্দু শাসকরা ছিলেন, অজাতপীড়, অবন্তিবর্মন, শঙ্করাবর্মন ও জয়াসীম (৮১৩-১১৪৯ খৃস্টাব্দ)। এই হিন্দু রাজারা, সকলেই নিজেদেরকে ভারতভূমির পুত্র বলেই মনে করেছেন।

এরপর দ্বাদশ শতকে তুর্কি মুসলিম হানাদাররা কাশ্মীরে ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে দখল করে। মধ্য এশিয়া থেকে আগত মুসলিম শাসক সেকেন্দার কাশ্মীরে ভয়াবহ অত্যাচার চালিয়ে সেখানের হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করে। মাত্র ১১টি হিন্দু পরিবার দুর্গম হিমালয়ে আত্মগোপন করে ধর্ম রক্ষা করেন। ১৫৪০ খৃস্টাব্দে হুমায়ুনের মুঘল সৈন্য কাশ্মীর দখল করে। এই সুদীর্ঘ মুসলিম শাসনের অবসান হয় ১৮১০ সালে যখন মহারাজা রণজিৎ সিংহ জম্মুকে মুক্ত করেন। তাঁর ডোগরা সেনাপতি গুলাব সিংহকে তিনি জম্মু শাসনের ভার দেন। ১৮৪৬ সালের ১৬ মার্চ অমৃতসরে এক শান্তিচুক্তিতে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গুলাব সিংহকে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজা বলে স্বীকার করে নেয়। এই তথ্য ভারতবাসীর জানা। ভারতের মানুষ চিরকালই কাশ্মীরকে অঙ্গরাজ্য হিসাবেই দেখেছে। খারাপ লাগে যখন দেখি অরুন্ধতী রায়েরা ভারতকে আগ্রাসী রাষ্ট্ররূপে চিহ্নিত করতে আদাজল খেয়ে লেগে পড়েছে। আর এদের তোষণ করতে দেওয়া হয় আকাদেমির মতো রাষ্ট্রীয় পুরস্কার!

৩১টি পুজো বয়কট

(১ পাতার পর)

(১০) ভাসলিয়া যুবক সঙ্ঘ, (১১) আমিনপুর শক্তি সঙ্ঘ, (১২) জোয়ারিয়া সার্বজনীন দুর্গাপুজো, (১৩) বিশ্বনাথপুর ক্যাম্প, (১৪) অম্বিকানগর অগ্রদূত ক্লাব, (১৫) কল্যাণী পদ্মরাজ পাড়া, (১৬) রামনাথপুর সার্বজনীন দুর্গাপুজো, (১৭) খেজুরডাঙ্গা বিশ্বনাথপুর উন্নয়ন সমিতি, (১৮) কিশোর সমিতি, চন্দনা, (১৯) পূর্ব চন্দনা কাপালি পাড়া, (২০) বেলেডাঙ্গা দাস পাড়া, (২১) হাদিপুর উদয় সঙ্ঘ, (২২) যাদবপুর গোল্ডেন তরুণ সঙ্ঘ, (২৩) যাদবপুর শক্তি সঙ্ঘ, (২৪) দেবালয় চারাবাগান, (২৫) মৌলপোতা গ্রাম, (২৬) ঝিকরা নেতাজী সঙ্ঘ, (২৭) গোলবাড়ি আমরা ক'জন, (২৮) আজিজনগর প্রবাহ, (২৯) আজিজনগর পল্লী সারথি, (৩০) কলিযুগ সার্বজনীন দুর্গাপুজো, (৩১) বুড়ির দুর্গা সার্বজনীন দুর্গাপুজো।

মুসলিম তাণ্ডব

(১ পাতার পর)

গুন্ডাদের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে তাদের এখনও অজ্ঞাত কারণে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। গ্রামবাসীদের অভিযোগ পরিকল্পনা করেই এ ধরনের আক্রমণ করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে বেশীর ভাগ মিডিয়া নীরব ভূমিকা পালন করছে। রাজনৈতিক দলগুলি মুসলিম ভোটের কারণে এই অন্যায়ের কোনও প্রতিবাদ করছে না বরং তাদের আড়াল করার চেষ্টা চালাচ্ছে। অন্যদিকে ওইদিনই সীমান্তবর্তী চাকুলিয়া থানার বিদ্যানন্দপুর গ্রামেও একই ধরনের ঘটনায় গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত। এখানকার মুসলিমরা সমস্ত হিন্দুদের দোকান বয়কট করেছে বলে জানা গেছে। এমনকী হিন্দুদের হুমকি দিচ্ছে। দিনের আলোয় পুলিশের সামনে যেভাবে মুসলিম দুষ্কৃতকারীদের তাণ্ডব বাড়ছে ও পুলিশ তথা রাজনৈতিক দলগুলি এতে নীরব ভূমিকা পালন করছে তাতে সমস্ত হিন্দু একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ না করলে এই ধরনের ঘটনা বাড়বে বলে স্থানীয় জনগণের অভিমত।

উত্তর দিনাজপুরে সমবেত তর্পণ

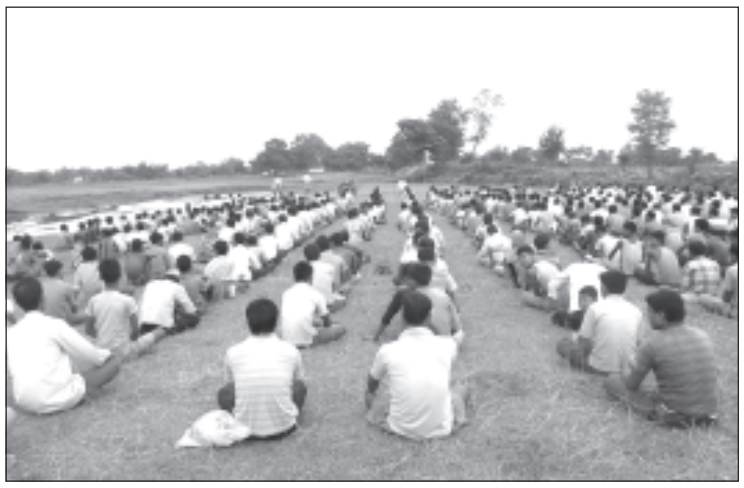

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ৭ অক্টোবর উত্তর দিনাজপুর জেলার চৈনগরে নদীর তীরে পাঁচশতাধিক স্বয়ংসেবক ও গ্রামবাসী একত্রিত হয়ে সমবেতভাবে তর্পণ ও শ্রীরামমন্দির নির্মাণকল্পে সংকল্প বাক্য পাঠ করেন। এছাড়া সকলে সমস্বরে শ্রীহনুমানচালিশা গান করেন। এদিন সকাল সাতটায় বিষ্ণুপুর, বামোইর, তিলান প্রভৃতি গ্রামের স্বয়ংসেবকরা মধ্যবর্তী চৈনগরে নদীতীরে সমবেত হন। যথারীতি গৈরিক পতাকা উত্তোলন করে শাখা শুরু হয়। পরে সমবেতভাবে তর্পণ মন্ত্র উচ্চারিত হয়। সংকল্প-বাক্য পাঠ করান জেলা সঙ্ঘচালক জগদীন্দ্রনারায়ণ সরকার ও উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সেবা প্রমুখ গৌতম সরকার। পরে শ্রীরামমন্দির পুনর্নির্মাণ আন্দোলনের বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেন সাপ্তাহিক স্বস্তিকার সহ-সম্পাদক বাসুদেব পাল।

প্রায় চার ঘণ্টা ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা কার্যবাহ বীরেন রায়, কালিয়াগঞ্জ নগর সঙ্ঘচালক গৌরমোহন চক্রবর্তী এবং সীমা কল্যাণ মঞ্চের উত্তরবঙ্গের আহ্বায়ক মটুকেশ্বর পাল।

রঙ্গম

উনিশ শতকের বাংলা গানে দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ

বিকাশ ভট্টাচার্য।। এখন প্রায় প্রত্যেকদিনই এখানে-ওখানে রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা, নাটক বা নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান হয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এই মাতামাতির কারণ তাঁর জন্মের সার্ধশতবর্ষ। এরই মধ্যে সম্প্রতি ডাইমেনশন ফোর সংস্থা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করে শিশির মঞ্চে। ''উনিশ শতকের বাংলা গান''। শিল্পী নূপুরছন্দা ঘোষ।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালির ভাবমানসে যে রেনেসাঁসের আলো প্রবেশ করেছিল তার সার্থক প্রকাশ ঘটেছিল সঙ্গীতেও। যে সঙ্গীতের প্রয়োজন বাঙালি জীবনের সমস্ত অনুষ্ঠানেই অপরিহার্য হয়ে আছে— সেই রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়াও ব্রহ্মসঙ্গীত, স্বদেশী গান, বাংলা টপ্পা ইত্যাদি বহু গানের এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার আমাদের আছে। হিন্দুমেলা যুগের পবরতী সময়ে রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র, সরলাদেবী, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, কামিনীকুমার ভট্টাচার্য প্রমুখ অনেক গীতিকবির গান উনিশ শতকে রচিত ও গীত হয়েছে। যে গানের ভাব, ভাষা ও সুর সময়ের চাহিদা মিটিয়েও কালজয়ী হয়েছে এর কাব্যিক ও সাঙ্গীতিক উৎকর্ষের জন্য। এই সমস্ত গীতিকারদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন ও দিলীপ রায়— এই চার গীতিকবির গান নিয়ে আয়োজিত হয়েছিল ''উনিশ শতকের বাংলা গান''-এর অনুষ্ঠান। সেদিনের অনুষ্ঠানে শিল্পী নূপুরছন্দার একক ও তাঁর শিক্ষার্থীদের সমবেত গানে উনিশ শতকের এক বিস্মৃত অধ্যায় যেন সুরে সুরে আমাদের সামনে ফিরে এলো।

অনুষ্ঠানের শুরু সংস্কৃত স্তোত্রপাঠে গুরুবন্দনার মধ্যে দিয়ে। এরপর একে একে রজনীকান্তের 'তুমি নির্মল কর', 'তব চরণ নিম্নে', দ্বিজেন্দ্রলালের 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে' সমবেতকণ্ঠে গীত হলো। সুন্দর তালিম, সুর ও লয়ে পরিবেশিত সমবেত সঙ্গীত মনকে আপ্লুত করে ভক্তিভাবে। এরপর শিল্পীর একক পরিবেশনে প্রথমে শুনলাম রজনীকান্তের 'শোনাও তোমার অমৃতবাণী।' ভাষ্যপাঠে অমিত রায়। জানা গেল এই গানটি থেকেই প্রভাবিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন তাঁর গান 'দাঁড়াও আমার আঁখির

নূপুরছন্দা

দেবরঞ্জন

আগে'। শিল্পী পরপর গাইলেন, 'ধীরে ধীরে মোরে টেনে লহ তোমা পানে', 'সখী রে, মরম পরশে তব গান' ইত্যাদি কয়েকটি গান।

অতুলপ্রসাদের গানে শিল্পী বেছে নিয়েছিলেন, 'কে আবার বাজায় বাঁশী', 'ডাকে কোয়েল বারে বারে', 'আমি বাঁধিনু তোমার তীরে তরণী' ইত্যাদি কিছু গান যার কথার সৌন্দর্যে আর সুরের যাদুতে পেয়েছে অনন্য মহিমা। গানগুলি শুনে অতুলপ্রসাদের সৃজনি বৈশিষ্ট্যের লাবণ্যকে অনুভব করা যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানে শিল্পী সেদিন বেছে নিয়েছিলেন তাঁর নাটকের গান। বিলেতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল সুদীর্ঘ সময় পাশ্চাত্য সঙ্গীত শিখেছিলেন। ভারতীয় রাগসঙ্গীতে তো তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। দেশজ বাউল, কীর্তনও তিনি জানতেন। এই সমস্ত শিক্ষা ও সাধনা তাঁর সৃজনশীলতায় রূপ পেয়েছে। সঙ্গে মিশে গেছে তাঁর কাব্যিক অনুভূতি।

সেদিনের শ্রুত গানগুলিতেই তার পরিচয় পাওয়া গেল। শাজাহান নাটকের 'বেলা বয়ে যায়, ছোট্ট মোদের পানসী তরী', দুর্গাদাস নাটকের 'হৃদয় আমার গোপন করে' গান দুটির পরিবেশনে শিল্পী গানের নাটকীয়তার সাথে তালের ছন্দোময়তা অপূর্বভাবে পরিবেশন করেছেন। দিলীপ রায়ের গান গাইতে গিয়ে তিনি বেছে নিয়েছিলেন, 'কী গুণ বল, কী গুণ জানে হরি হে তোমার বাঁশরি' এবং 'এ যে কোন কর্মনাশা' ইত্যাদি গান। প্রথম গানটি ছোটবেলায় রেকর্ডে খুব শুনতাম, আঙ্গুরবালা না ইন্দুবালা কার কণ্ঠে ঠিক মনে নেই।

শেষ পর্যায়ে চার গীতিকবির চারটি দেশাত্মবোধক গানের কোলাজ। অতুলপ্রসাদের স্বল্পশ্রুত 'ভারত ভানু কোথা লুকালে', রজনীকান্তের 'আজ কিসের শঙ্কা', ডি. এল. রায়ের 'ধন্যধান্য পুষ্পভরা' এবং দিলীপ রায়ের 'ভারত রাত্রি, প্রভাতিল যাত্রী' সমবেত কণ্ঠে শোনা গেল। নূপুরছন্দা এইসব গান নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা ও চর্চা করছেন— তাঁর নিবেদন এক কথায় অনবদ্য। শুধু সেদিনের অনুষ্ঠানে 'ধন্যধান্য'-র জায়গায় ডি.এল. রায়ের 'ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে, গাও উচ্চে রণজয়গাথা' গানটি যদি শোনা যেত, তাহলে বড় ভালো লাগত। ডি.এল. রায়ের বীরত্বব্যঞ্জক এই গানটি আজ আর কোথাও শুনি না।

দেবরঞ্জনের নতুন সি.ডি.

পেশায় আইনজীবী হলেও শিল্পী দেবরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেশা রবীন্দ্রসঙ্গীত। সংস্কার ভারতীর একনিষ্ঠ কার্যকর্তা এই শিল্পীর বহু ওজস্বী গান বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শুনেছি। হাওড়ায় ইনি বেশ জনপ্রিয়ও বটে। সম্প্রতি সাগরিকা মিউজিক তাঁর বারোটি গানের এক কমপ্যাক্ট ডিস্ক প্রকাশ করেছে। যদিও বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে ''বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের গানে মা মাটি মানুষ''। রবীন্দ্রনাথের গান কালজয়ী। কোনও বিশেষ ক্যাপশনের কি দরকার আছে? 'সাগরিকা' অবশ্য প্রচারের আলোয় আনার জন্যই এটা করেছে। তাতে সি.ডি.-র গানের কিছু রকমফের হয়নি। অত্যন্ত সুগীত গানগুলি শুনলেই মন কাড়ে। সঙ্গীত আয়োজন আর এক প্রতিষ্ঠিত শিল্পী অগ্নিভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ডিস্কে আছে মোট বারোটি গান। তারমধ্যে 'নাই নাই ভয়', 'মাটি তোদের ডাক দিয়েছে', 'আমরা চাষ করি আনন্দে', 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে', 'আমরা নূতন যৌবনেরই দূত', 'আমাদের ভয় কাহারে', 'বাঁধ ভেঙ্গে দাও', 'উড়িয়ে ধবজা' এবং অবশ্যই 'ও আমার দেশের মাটি'। গানগুলি চয়নের জন্য অবশ্যই শিল্পী দেবরঞ্জন ধন্যবাদ পাবেন।

শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শাখার সহ-নগর কার্যবাহ সুরজিৎ পাহান-এর মাতৃদেবী সুরধনী পাহান গত ২১ সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করেন। তিনি পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছেন।

* * *

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গোপালপুর শাখার স্বয়ংসেবক ললিত মোহন মাহাতো গত ৩ অক্টোবর বিকেলে ৮২ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি পাঁচ পুত্র ও ২ কন্যা রেখে গেলেন। উল্লেখ্য, তার দ্বিতীয় পুত্র অমিয় মাহাতো দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সঙ্ঘের সেবা প্রমুখ।

* * *

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট নগরের স্বয়ংসেবক বিশ্বনাথ মল্লিক গত ২৯ সেপ্টেম্বর ভোরে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেলেন।

* * *

শিলিগুড়িস্থিত সেবক রোডের বাসিন্দা ও স্বয়ংসেবকদের কাছে মাতৃসমা গীতা মিত্র গত ১৮ আগস্ট তাঁর ৭৮ তম জন্মদিনে সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন। তাঁর স্বামী রবীন্দ্রনাথ মিত্র বর্তমান।

* * *

নদীয়া জেলার প্রাক্তন জেলা সঙ্ঘচালক দীনেশচন্দ্র সাহার সহধর্মিনী আশারাণী সাহা গত ১৯ অক্টোবর সজ্ঞানে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। তার দুই পুত্র বর্তমান। উল্লেখ্য তিনি কিছুদিন ধরে শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ভুগছিলেন।

রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সংঘর্ষ অশ্রদ্ধা অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে কেন?

সাধন কুমার পাল

এ রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এখন যেন রাহুগ্রাসের কবলে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত একই অবস্থা। ছাত্র সংঘর্ষ, ঘেরাও, অবরোধ, শিক্ষক-অধ্যাপকদের হেনস্থা, প্রতিষ্ঠানে তালা ঝোলানো এখন নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। শুধুমাত্র ভর্তি বা বিভিন্ন নির্বাচন-কে ঘিরেই যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পেশী শক্তির প্রদর্শন হচ্ছে তা কিন্তু নয়, নকল করার দাবি, নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার দাবি, পাশ করিয়ে দেওয়ার দাবিতেও মারমুখি হয়ে উঠছে ছাত্রছাত্রী অভিভাবক অভিভাবিকাদের একাংশ। অতি সম্প্রতি ঘটে যাওয়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ঐতিহ্যশালী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ক্লোজড সার্কিট টিভি বসানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা উপাচার্য, সহ-উপাচার্য, রেজিস্টার, এগজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যদের টানা দু'দিন দু'রাত্রিরও বেশি সময় ধরে ঘেরাও এর ঘটনা, কলকাতার হেরম্বচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষের গায়ে পেট্রোল ঢেলে দেওয়ার ঘটনাগুলো রাজ্যের 'ছাত্র রাজনীতির' ইতিহাসে নতুন নতুন পৃষ্ঠা সংযোজন করে চলেছে। বিশেষ করে কলেজগুলোতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট ছাত্রছাত্রীদের একাংশের গুণ্ডামি মস্তানি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সাধারণ ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠান লাগোয়া এলাকার বাসিন্দা, পথচারিরা পর্যন্ত ভয়ে জড়সড় হয়ে যাচ্ছে। সারা বাংলা অধ্যক্ষ পরিষদের রাজ্য কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অসীম মুখোপাধ্যায় সাংবাদিকদের ডেকে তাঁদের অসহায় অবস্থার কথা জানিয়ে বলেছেন, পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে কলেজে যাওয়ার পর অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকরা বাড়ি ফিরে আসবেন কিনা তা নিয়ে তাদের পরিবার উদ্বেগে থাকেন। এ কথা থেকে এটা পরিষ্কার যে দীর্ঘ বাম শাসনে এ রাজ্যে শিক্ষার এমনই হাল হয়েছে যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাওয়া সেনা জওয়ানদের পরিবারের আপনজনেরা যতটা উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় দিন কাটায় কলেজে পড়াতে যাওয়া অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের পরিবারের আপনজনেরাও ঠিক ততটাই উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন।

প্রশ্ন হচ্ছে, সাম্প্রতিককালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশের এতটা অবনতি হলো কেন? একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বিগত ৩৪ বছর ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে ছাত্র, শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারী থেকে শুরু করে যতরকম সংগঠন সক্রিয় সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে ছাত্র রাজনীতির আড়ালে ছাত্রছাত্রীদের মস্তিষ্কে বামপন্থার বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্যাডার তৈরির আঁতুড় ঘর এবং একই সাথে বাম রাজনীতির প্রয়োগশালা হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। যার ফলে প্রতিষ্ঠানগুলোতে অবাম ছাত্রশক্তির মূলোচ্ছেদ, শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের হেনস্থা, দলদাস অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের দিয়ে নম্বর বাড়িয়ে নেওয়া, মেধা তালিকার বাইরে ভর্তির জন্য অবৈধ লেনদেন, ছাত্রছাত্রীদের থেকে চাঁদা হিসেবে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে ফূর্তি করা, প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ফাণ্ডগুলোকে নয়ছয় করার মতো ঘটনা স্বাভাবিক চিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিরোধী শক্তিহীন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সিপিএম-এর ছাত্র ক্যাডারদের এই সমস্ত অবৈধ ভোগ দখলে ছিল একছত্র অধিকার। কিন্তু বাদ সেধেছে পরিবর্তনের হাওয়া। ওয়াকিবহাল মহলের মতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বর্তমান অশান্তি যতটা না ছাত্ররাজনীতির জমি দখলের লড়াই তার চেয়ে অনেক বেশি এই সমস্ত অবৈধ ভোগের জমি দখলের লড়াই।

স্কুলগুলোতে ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনা তেমন না ঘটলেও পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির আঁচ পাচ্ছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এক সময় বাম বিরোধী দু'চারজন শিক্ষককে হেনস্থা করার জন্য যেমন সিপিএমের মদতপুষ্ট স্বঘোষিত স্থানীয় অভিভাবকেরা 'সময় মতো আসবেন,' 'ভালো করে পড়াবেন' বলে শাসাতেন আর এখন রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও অনেক সময় পাড়ার ছেলেরা/ক্লাবের ছেলেরা শুধুমাত্র দৃষ্টি-গোচর হওয়ার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের ধমকাতে ছাড়ে না। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে ছাত্রছাত্রীরা যত উচ্ছৃঙ্খল হউক না কেন, স্কুলে যত অপ্রত্যাশিত ঘটনাই ঘটুক না কেন শিক্ষক শিক্ষিকারা চুপচাপ থাকাই শ্রেয় মনে করেন। কারণ, অভিভাবক কুলের রোষের ভয়, মিথ্যে অপবাদে হেনস্থা হওয়ার ভয়, আইনগত ঝামেলায় জড়িয়ে যাওয়ার ভয় সব সময় তাদের তাড়িয়ে বেড়ায়। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা একটু পরিণত বলে এই সমস্ত ঘটনার কুপ্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারলেও বিদ্যালয়স্তরের কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা এই সংঘর্ষ, অশ্রদ্ধা অবিশ্বাসের পরিবেশের মধ্যে বড় হচ্ছে বলে তাদের ভবিষ্যত ক্রমেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। যে বামফ্রন্ট এরাজ্যে অবৈতনিক শিক্ষা চালু করে ছাত্রছাত্রীদের ও লোভনীয় বেতনভাতা চালু করে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের ভাগ্য ফিরিয়ে দিয়েছে বলে নিরন্তর প্রচার চালিয়ে গেছে। তাদের ভাগ্যাকাশে রাজনৈতিক ঝড়ের সঙ্কেত দেখা দিতেই শুধুমাত্র দলদাস শিক্ষক শিক্ষিকা নয়, শিক্ষাব্রতী শিক্ষক শিক্ষিকা ও পড়াশুনা করতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের কপালে এমন বিড়ম্বনা নেমে এল কেন এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজাটা আজ বোধ হয় সবচেয়ে জরুরী বিষয়।

১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগে এ রাজ্যের শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। এদের বেতন ভাতা কোনটারই কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে প্রথমেই সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত সমস্ত বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের বেতন ভাতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিলেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের মাধ্যমে প্রতিমাসে এই বেতনভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা হলো। নিয়মিত বেতন ভাতার সাথে সাথে ১৯৮১ সালে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যও চালু হল ডেথ-কাম রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট স্কিম। ১৯৮১ সাল থেকেই অনুমোদন প্রাপ্ত বেসরকারি স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা সরকারি কর্মচারীদের মতোই সমহারে পেনশন ও অন্যান্য অবসরজনিত আর্থিক সুযোগ সুবিধার আওতায় এলেন। এই ৮১ সালেই রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের বেতন হার সংশোধন ও পুনর্বিন্যাস এবং সেই সাথে সরকারি কর্মীদের সমহারে মহার্ঘ ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৮০-র জানুয়ারি থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ও ১৯৮১-র জানুয়ারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হলো।

বিগত ৩৪ বছর ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে ছাত্র, শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারী থেকে শুরু করে যতরকম সংগঠন সক্রিয় সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে ছাত্র রাজনীতির আড়ালে ছাত্রছাত্রীদের মস্তিষ্কে বামপন্থার বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্যাডার তৈরির আঁতুড় ঘর এবং একই সাথে বাম রাজনীতির প্রয়োগশালা হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।

এই সমস্ত আর্থিক ও অবসরকালীন নিশ্চয়তা প্রদান করার বিনিময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এমন এক পরিবেশ তৈরি করা হল যে, খুব অল্প কথায় তার অর্থ দাঁড়ায় শিক্ষক শিক্ষিকাদের সিপিএম সমর্থক না হওয়ার অর্থ নিমক খেয়ে নিমক হারামি করা। এখন 'নিমকহারাম' হাওয়ার ভয়েই হোক আর ভক্তিতেই হোক শিক্ষক মানেই এবিটিএ-এর বকলমে সিপিএম— এটাই যেন এ রাজ্যে প্রথা হয়ে দাঁড়াল। এক শ্রেণীর শিক্ষক পার্টির কাছে এত সক্রিয় হয়ে উঠলেন যে ছাত্র পড়ানোর চেয়ে দলীয় কর্মসূচীগুলোই তাদের কাছে বড় হয়ে উঠল। শিক্ষকতা পেশার সাথে যুক্ত এই সমস্ত সিপিএম নেতারা অনিয়মিত স্কুলে গিয়ে বা মাসের পর মাস স্কুলে না গিয়ে মাইনে তুলছেন এমন দৃশ্য রাজ্যবাসীর কাছে গা-সওয়া হয়ে উঠল। ফলে একটা সময় দেখা গেল যে পার্টির নীচুতলার নেতৃত্ব, নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য থেকে শুরু করে বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার বেশ একটা ভালো অংশ শিক্ষকতা পেশার সাথে যুক্ত।

বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই এখানে এমন একটি ব্যবস্থা চালু ছিল যে, কেউ ইচ্ছে করলেই প্রাথমিক বা জুনিয়র হাইস্কুল খুলে তাদের ইচ্ছে মতো শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ করে সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য আবেদন করতেন। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে একমাত্র সেই সব স্কুলকেই অনুমোদন দিতে শুরু করল যেগুলো পার্টির নেতাদের দ্বারা ও স্বক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হতো। শুধুমাত্র সিপিএম নেতাদের কৃপা দৃষ্টির অভাবে সবদিক থেকে অনুমোদন পাওয়ার যোগ্য এরকম কত স্কুল যে অনুমোদন পায়নি আর দীর্ঘদিন থেকে গামছা বেধে এই সমস্ত স্কুলে পড়িয়ে কত শিক্ষক শিক্ষিকা যে শেষ পর্যন্ত শিক্ষকদের জন্য বামেদের আনা নতুন ভোরের দর্শন পায়নি তার একটি পরিসংখ্যান থাকলে শিক্ষার উন্নয়ন নিয়ে সিপিএম-এর ভন্ডামিটা আরও ভালোভাবে প্রকাশ হোত। স্কুলগুলোর পরিচালন সমিতি দখল করে এগুলোতে নিয়োগ ব্যবস্থা এতটাই ফুলপ্রুফ করা হলো যে মোটা অর্থ ও পার্টির আনুগত্য ছাড়া নিয়োগের দরজা দিয়ে একটি মাছিও গলবার উপায় ছিল না। এতে পার্টির অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি ও ক্ষমতার লড়াই এতটাই বাড়ল যে ১৯৯২-এর আগস্টে পেশ করা অশোক মিত্র কমিশনের রিপোর্টে এই সমস্ত দুর্নীতির উল্লেখ করে স্কুল সার্ভিস কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হোল।

স্কুল সার্ভিস কমিশন গঠিত হলেও প্রথমদিকে পরীক্ষা ব্যবস্থা ও পোস্টিং দুটো নিয়েই ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি জন্ম নিল। প্রধান শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রথমদিকে লিখিত পরীক্ষা চালু হলেও পরবর্তীকালে তা তুলে দিয়ে পার্টির অনুগত শিক্ষক শিক্ষিকাদের বিদ্যালয় প্রধানের চেয়ারে বসানোর জন্য শুধুমাত্র ইন্টারভিউও শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর দেওয়া নম্বরের ভিত্তিতে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হতে লাগল। এতে ঘটে চলা বিভিন্ন অনিয়মের ফলে মামলার পাহাড় জমতে লাগল উচ্চ আদালতে। ফলে সরকার একরকম বাধ্য হয়েই সহশিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে পোস্টিং-এর জন্য কাউন্সেলিং ব্যবস্থা ও প্রধান শিক্ষক নিয়োগের জন্য পুনরায় লিখিত পরীক্ষা চালু করে কিছুটা হলেও স্বচ্ছতা আনতে বাধ্য হয়েছে। ঠিক একইরকম ভাবে কলেজ শিক্ষক নিয়োগের জন্য গঠিত কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাত্রা ছাড়া দুর্নীতি ও সংকীর্ণ দলতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের ফলে সংস্থাটিকে এখন রাজ্যবাসী ক্যাডার সার্ভিস কমিশন হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কলেজের অধ্যক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থেকে শুরু করে শিক্ষা দপ্তরের যে কোনও রকম উচু পদের কোনটাতেই যে সিপিএম সমর্থক ও পার্টির একান্ত অনুগত অনুচর ছাড়া যে পৌঁছানো সম্ভব নয় একথা এখন এরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত সত্য।

একটু ভালভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বামপন্থী সংস্কৃতিতে আষ্টেপৃষ্ঠে বেধে ফেলার প্রয়াসে সিপিএম দারুণ ভাবে সফল হয়েছে। ফলে এখানে এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে উঠল যে ভালো মাস্টারমশাইরা নন— পার্টিকর্মী, শিক্ষক সমিতির নেতা, ফাঁকিবাজ মাস্টারমশাইরা মানে-সম্মানে সবদিক থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শেষ কথা হয়ে উঠলেন। কর্তব্যনিষ্ঠা বা ছাত্রছাত্রীদের প্রতি দায়বদ্ধতা নয়, সিপিএম-এর শিক্ষক সমিতির সদস্য পদ হয়ে উঠল চাকরিস্থলে সুরক্ষিত থাকার একমাত্র উপায়। এই সুরক্ষা বলয় এতটাই গ্যারান্টি যুক্ত হয়ে উঠল যে যত বড় অনিয়মই হোক না কেন সিপিএম নেতাদের সম্মতি ছাড়া বিদ্যালয় পরিদর্শক বা শিক্ষা দপ্তরের উচ্চ পদাধিকারীদেরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস পর্যন্ত থাকল না। যখন তখন স্কুল ছুটি দিয়ে এমনকী পরীক্ষা বাতিল করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পার্টির মিছিল, মিটিং সম্মেলন করা বাম জামানায় একটি স্বাভাবিক চিত্র হয়ে উঠল। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির চেয়ে নানা ফন্দিফিকির করে নম্বর বৃদ্ধিই এ রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য এ বিষয়ে আজ আর বোধহয় খুব একটা বিতর্কের অবকাশ নেই। ফলে কুমির ছানার মতো বারবার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে বর্ধিত পাশের হার দেখানো ছাড়া এ রাজ্যে শিক্ষার সাফল্য হিসেবে প্রদর্শনের জন্য আজ আর তেমন কিছু অবশিষ্ট নেই বললেই চলে।

আজ পশ্চিমবঙ্গের ছন্নছাড়া শিক্ষা চিত্রের দিকে তাকিয়ে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য নয়, বিশুদ্ধ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই শিক্ষক শিক্ষিকাদের আর্থিক নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল ও অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। দেশের ইতিহাসে রেকর্ড সময় ক্ষমতায় থেকে সেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হলেও গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটাই আজ মানুষের আস্থাহীনতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে চলেছে। ফলে একথা আজ মানুষের মনে গেঁথে গেছে যে সরকারি ও সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত স্কুলগুলোতে একেবারেই পড়াশুনা হয় না। উচ্চবেতনভোগী শিক্ষক-শিক্ষিকারা আন্তরিকতা সহকারে পড়ানোর চেষ্টা করেন না। একাধিক প্রাইভেট টিউশন ছাড়া এ রাজ্যে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা সম্ভব নয়।

সিপিএম-এর কঠোর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ থাকার জন্য এতদিন মানুষের এই সমস্ত ক্ষোভ প্রকাশিত হয়নি। পরিবর্তনের হাওয়ার জেরে এই রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ আলগা হতেই শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঘিরে মানুষের ক্ষোভ আছড়ে পড়ছে।

দীর্ঘ বাম শাসনে গড়ে উঠা ধ্যান-ধারণা অনুসারে এটা মনে হতে পারে যে শিক্ষক শিক্ষিকাদের রাজনৈতিক রং পরিবর্তন করলেই হয়তো এই সমস্ত ক্ষোভ বিক্ষোভের পরিসমাপ্তি হবে। এই ভাবনায় ভাবিত হয়ে অনেকেই হয়তো সিপিএম ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে নাম লেখাচ্ছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে পরিবর্তিত রাজনৈতিক রঙ কি শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিরাপত্তা দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে মানুষের ক্ষোভের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে? বলার অপেক্ষা রাখে না রাজনৈতিক রঙ কেন্দ্রিক নিরাপত্তার ভাবনা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাময়িক স্বস্তি দিলেও এই ধরনের কৌশল রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও নীচে নামিয়ে দেবে।

যাইহোক, বর্তমান ক্ষোভ বিক্ষোভ প্রতিরোধে অনেকের অনেক ভাবনা থাকতে পারে, তবে পরিশ্রম, সততা, কর্তব্য নিষ্ঠার মাধ্যমে অর্জিত সামাজিক আস্থাই যে শিক্ষক অধ্যাপকদের স্থায়ী নিরাপত্তা দিতে পারে এ বিষয়ে কোনও বিতর্ক থাকতে পারে না। বিষয়টি কঠিন ও সময়সাপেক্ষ হলেও এর কোনও বিকল্প নেই। যে যাই বলুক, পড়ুয়াদের বাবা মায়েদের ভিড়ে কান পাতলে এখন একটিই কথা শুনা যায়, অনেক হয়েছে এবার শিক্ষাক্ষেত্রে দলীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশ বন্ধ হওয়া উচিত। নিষিদ্ধ হওয়া উচিত শিক্ষক অধ্যাপকদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ।

Swastika
1 November - 2010, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

ভারত স্বাভিমান ট্রাস্টের দাবী ভারতের কালো টাকা উদ্ধার সম্ভব

মঞ্চে (বাঁ দিক থেকে) অশোক আগরওয়াল, কে এল টামটা, রাজীব দীক্ষিত ও সুনীলপদ গোস্বামী।

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কালো টাকা উদ্ধারে সচেষ্ট হয়েছেন যোগগুরু বাবা রামদেবজী এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ভারত স্বাভিমান ট্রাস্ট'।

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রাহুল গান্ধী ক'দিন আগে রামদেবজীর সঙ্গে দেখা করেছেন। সেজন্য বিভিন্ন সংবাদপত্রে খুব আলোচনা, চাপান-উতোর, নানা কথা রটেছে। সাক্ষাৎকারের কয়েকদিন আগেই রাহুল গান্ধী আর এস এস ও সিমি সমগোত্রীয় বলে তার বুদ্ধি-বিদ্যার দৌড় জাহির করেছিলেন। গত ২২ অক্টোবর কলকাতায় কেশব ভবন সভাগারে 'বড়বাজার লাইব্রেরি' আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এই প্রসঙ্গ উথাপন করে সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটান ট্রাস্টের অন্যতম কর্মকর্তা রাজীব দীক্ষিত। দীক্ষিতজী জানান, বিগত লোকসভা নির্বাচনের আগে রাহুলজী কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে বিদেশে ভারতীয়দের গচ্ছিত 'কালো টাকা' ফেরৎ নিয়ে আসবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। বাবা রামদেবজী তাঁর সেই প্রতিশ্রুতির কথাই বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

স্বস্তিকা

দীপাবলী বিশেষ সংখ্যা

৮ নভেম্বর, '১০ প্রকাশিত হবে

গান্ধীজী তাঁর জনসভা শুরু করতেন রামধুন দিয়ে। ভারতবাসীর মানসপটে মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামের যে ছবি রয়েছে বিশ্বের কোনও শক্তিই তা মুছে দিতে পারেনি। বাবর চেয়েছিল, অযোধ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে রামমন্দির ও রামের মহিমা লোপাট করতে। রামমন্দিরের জন্য যুদ্ধ হয়েছিল ৭৬ বার। শত সহস্র শহীদের রক্তপাত ও লক্ষ লক্ষ করসেবকদের আত্মত্যাগে শ্রীরাম আজও অযোধ্যায় প্রতিষ্ঠিত। রাম ও রামজন্মভূমি আন্দোলন নিয়ে এবারের অনবদ্য প্রয়াস -- 'রাম ও রামজন্মভূমি আন্দোলন'

লিখছেন ঃ- শ্রীমদ্ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী, প্রীতিমাধব রায়, প্রসিত রায়চৌধুরী, ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত, সংকর্ষণ মাইতি, বাসুদেব পাল, নবকুমার ভট্টাচার্য, অর্ণব নাগ প্রমুখ।

রঙিন প্রচ্ছদ।। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে।। দাম ছয় টাকা।।

GOVERNMENT OF KARNATAKA

সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ

প্রিয় রাজ্যবাসী,

সাম্প্রতিক রাজনৈতিক টানা-পোড়েনের প্রেক্ষিতে কর্ণাটক রাজ্যের মহামহিম রাজ্যপাল আমাদের সরকারকে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের নির্দেশ দেন। ওই নির্দেশ অনুসারে গত ১০ অক্টোবর ২০১০ তারিখে আমি বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাচাই করার জন্য সদস্যদের মতামত জানতে চাই এবং ধ্বনি ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করি। এরপরেই মহামহিম রাজ্যপাল পুনরায় ১৪ অক্টোবর ২০১০ তারিখে আমার সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করার নির্দেশ দেন। গণতন্ত্রের মহান ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান জানিয়ে রাজ্যপাল মহোদয়ের নির্দেশ পালন করি এবং বিধানসভায় ওই নির্দ্ধারিত দিনেই পুনরায় আমার সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করি।

বিগত কিছুদিন ধরে ঘটে যাওয়া এইসব ঘটনায় আমি অত্যন্ত ব্যথিত। এই ঘটনাগুলি আমাদের রাজ্যের সুনামের পরিপন্থী। বিশেষত যে রাজ্য নৈতিকতা এবং জনজীবনে মূল্যবোধকে সর্বদা মর্যাদা দিয়েছে। এই রাজ্যের বহু নেতা মূল্যবোধের রাজনীতিতে দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ রেখেছেন। আজ আমাদের সেই সুনামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আমাদের সরকার এ বিষয়ে বিরোধী দলসহ সবাইকে নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত।

সাম্প্রতিক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাগুলির জন্য আমি আপনাদের নিকট ক্ষমা চাইছি এবং সেইসঙ্গে আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই যে, আমার নেতৃত্বাধীন সরকার সমৃদ্ধ কর্ণাটক রাজ্য নির্মাণের লক্ষ্যে সর্বোতভাবে দায়বদ্ধ।

কৃষিকে উন্নত করা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। কিছুদিন আগে শিল্পের উন্নতির জন্য আমরা যেমন বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীদের একটি সম্মেলনের আয়োজন করেছিলাম, তারই অনুসরণ করে অদূর ভবিষ্যতে কৃষির উন্নতির লক্ষ্যে একটি সম্মেলনের আয়োজন করবো। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণে আমার প্রধান লক্ষ্য এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মানুষের চাহিদা অনুসারে এইসব প্রকল্পের বাস্তবায়ণ করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

দুঃসময়ে যে সমস্ত বিধায়কগণ সর্বশক্তি নিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন তাদের সবাইকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানানো আমার একান্ত কাম্য এবং একই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই যারা এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য ভোটাভুটির প্রক্রিয়াকে নির্বিঘ্নে করার জন্য সহযোগিতা করেছেন। আমি সমস্ত রাজ্যবাসীকে রাজ্যে শান্তি এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ব্যাঙ্গালোর
১৫.১০.২০১০

বি. এস. ইয়েদুরাপ্পা
মুখ্যমন্ত্রী

Karnataka Information

Steelam
EXCLUSIVE FURNITURE

স্টীলম ত্রর .....
পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে
Exclusive Show Room
দেওয়া হইবে॥
Factory :- 9732562101

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com